ইউনিট ১
উদ্ভিদ রোগের ধারণা, গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট

ইউনিট ১ উদ্ভিদ রোগের ধারণা, গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট

উদ্ভিদ রোগ পৃথিবীর বুকে এমন কোনো নতুন ঘটনা নয়। রোগ হলে উদ্ভিদের দেহক্রিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে উদ্ভিদের গোটা দেহে বা দেহাংশে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। অনেক সময় অকাল মৃত্যু হয়। মৃত্যু না হলেও উদ্ভিদের ফলন অনেক কমে যায়। বিভিন্ন

রোগের জন্য বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বিভিন্ন হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোগের জন্য এ ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ। ফসল উৎপাদন হ্রাস ছাড়াও কৃষি পরিকল্পনা, কৃষি ব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির ওপরও উদ্ভিদের রোগের প্রভাব বিপুল। উদ্ভিদে রোগ বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রোগের ফলে ফসলের চাষ বন্ধ হয়ে কৃষি ব্যবস্থা পাল্টে যায়। মহামারীর সৃষ্টি হয় ফলে মানুষ নিজ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হওয়ায় মানুষকে খাদ্যাভ্যাস পাল্টাতে হয়। কাঁচামালের অভাবে অনেকক্ষেত্রে শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যহত হয়। খাদ্য বিষাক্ত

হওয়ায় মানুষ ও পশুপাখি ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়। সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয়। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে উদ্ভিদ রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার, লক্ষণ, শ্রেণিবিভাগ, রোগনাশকের শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োগ পদ্ধতি, রোগজীবাণু শণাক্তকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১.১ উদ্ভিদ রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার

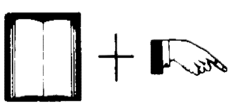

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদ্ভিদের রোগ বলতে কী বুঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- উদ্ভিদ রোগের কারণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- উদ্ভিদ রোগ কীভাবে বিস্তারলাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

উদ্ভিদ রোগের উৎপত্তি

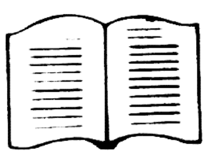

সাধারণ অবস্থায় গাছ পূর্ণ বিকশিত হওয়ার জন্য এর দেহাভ্যান্তরে স্বাভাবিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়। ঐ কাজগুলো সর্বদাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সমতা রক্ষা করে চলে। এ সমতায় বিঘ্ন ঘটলেই রোগের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ উৎপাদক এ বিঘ্ন ঘটায়। গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথস্ক্রিয়ার (interaction) ফলে গাছে যে বিকৃত ধরনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে তার ফলে গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। যতক্ষণ রোগে গাছটি মরে না যায় বা গাছের প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় না হয়ে পড়ে ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া চলতে

গাছের কোনো অংশ রোগাক্রান্ত হলে ঐ অংশের কোষগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে ও আনুষাঙ্গিক লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে।

থাকে এবং রোগের বিভিন্ন লক্ষণ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। গাছের কোনো অংশ রোগাক্রান্ত হলে ঐ অংশের কোষগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে এবং আনুষাঙ্গিক লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে, গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে অকালে মৃত্যু হতে পারে। আর

মৃত্যু না হলেও গাছের ফলন কমে যায়। উদ্ভিদ রোগের কারণসম হকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

উদ্ভিদ রোগের জীবীয় কারণ

- উদ্ভিদ – যথা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, পরগাছা, মাইকোপ্লাজমা ও পাইম মোল্ড ইত্যাদি।
- প্রাণী – যথা, কৃমি, পোকামাকড়, মাইট ইত্যাদি।
- ভাইরাস ও ভাইরোয়েডজাতীয় অতি ক্ষুদ্র সংক্রামক নিউক্লিওপ্রোটিন কণা।

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ রোগের অন্যতম কারণ। ব্যাকটেরিয়া এককোষী উদ্ভিদ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবুজ কণাবিহীন। এদের নিউক্লিয়াস সরল ও সাইটোপ্লাজমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে এবং অনুপ্রস্থ বা দ্বিভাজন পদ্ধতিতে প্রজনন সম্পন্ন করে। এদের দেহে এক বা একাধিক ফ্লাজেলা থাকতে পারে এবং কতিপয় প্রজাতি স্পোর উৎপন্ন করে। এরা মৃতজীবী অথবা পরজীবী এবং বায়ুজীবী অথবা অবায়ুজীবী। এরা গোলাকার, লম্বা, কমা অথবা প্যাঁচানো হতে পারে। তবে উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী সকল ব্যাকটেরিয়া লম্বাকৃতির। চিত্র ১ দেখুন।

চিত্র ১ ঃ ব্যাকটেরিয়া (সঞ্চালকযুক্ত)

ছত্রাক

ছত্রাক সবুজকণাবিহীন উদ্ভিদ। এদের কোনে কান্ড, শিকড় ও পাতা নেই। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না। এ কারণে এরা মৃতজীবী, পরজীবী অথবা মিথোজীবী। এদের দেহ এককোষী বা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, সূতাকৃতি এবং বহুকোষী। এরা চলাফেরা করতে পারে না। যৌন বা অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে। কোষপ্রাচীর কাইটিন দ্বারা নির্মিত। এদের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন। অধিকাংশ উদ্ভিদ রোগ ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে। ছত্রাকের জন্য চিত্র ২ দেখুন।

চিত্র ২ ঃ ছত্রাক
ক- এককোষী বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক
খ- বহুকোষী সূতাকৃতি ছত্রাক

মাইকোপ-াজমা

মাইকোপ্লাজমা ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া থেকে অনেক ছোট এবং আলোক মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না। বস্তুত এদেরকে জীবজগতের ক্ষুদ্রতম কোষ বলা যেতে পারে। এদের কোষ

প্রাচীর নেই কিন্তু তিনস্তরবিশিষ্ট অত্যন্ত সম্প্রসারণশীল (elastic) প্লাজমামেমব্রেন দ্বারা আবৃত। এরা দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে, স্পোর উৎপাদনের মাধ্যমে প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এরা পরজীবী অথবা অপরজীবী এবং

টেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল। মাইকোপ্লাজমার জন্য চিত্র ৩ দেখুন।

চিত্র ৩ ঃ মাইকোপ-াজমা

> রোগ উৎপাদক কৃমির মুখে বর্শার মতো স্টাইলেট নামে এক প্রকার অঙ্গ থাকে। এর মাধ্যমে কৃমিরা গাছকে দংশন করে রস শোষণ করে।

কৃমি

কৃমি খুবই ছোট আকৃতির জীব ও দেখতে মূলা, নাশপাতি, লেবু, লাটিম অথবা সূতার ন্যায়। এদের মুখ, পাকস্থলী ও লেজ আছে। রোগ উৎপাদক কৃমির মুখে বর্শার মতো স্টাইলেট নামে এক প্রকার অঙ্গ থাকে। এর মাধ্যমে কৃমিরা গাছকে দংশন করে রস শোষণ করে। এদের খাদ্যনালী, রেচকনালী ও প্রজনন অঙ্গ আছে। স্ত্রী কৃমি পুরুষ কৃমি থেকে বড় এবং একসঙ্গে ৫০০-৩০০০টি ডিম পড়তে পারে। কৃমির জন্য চিত্র ৪ দেখুন।

চিত্র ৪ ঃ কৃমি (স্টাইলেট)

> যেসব পরজীবী কান্ডকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে সেগুলোকে কান্ডাশ্রয়ী এবং যেগুলো মূলকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে সেগুলোকে মূলাশ্রয়ী পরজীবী বলা হয়।

সপুশ্পক পরজীবী উদ্ভিদ

এরা এক প্রকার উদ্ভিদ এবং জীবনধারণের প্রকৃতি অনুযায়ী এদেরকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- সম্পূর্ণ পরজীবী ও আংশিক পরজীবী। আবার যেসব পরজীবী কান্ডকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে সেগুলোকে কান্ডাশ্রয়ী এবং যেগুলো মূলকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে সেগুলোকে মূলাশ্রয়ী পরজীবী বলা হয়। নিচে সপুষ্পক পরজীবীর একটি তালিকা দেওয়া হলো।

- সপুষ্পক পরজীবী উদ্ভিদ →
  - সম্পর্ণ পরজীবী (প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি পোষক থেকে গ্রহণ করে ১ →
    - কান্ডাশ্রয়ী পরজীবী (যথা- স্বর্ণলতা)
    - মূলাশ্রয়ী পরজীবী (যথা- ভুলকি)
  - আংশিক পরজীবী (পোষক থেকে আংশিক পুষ্টি গ্রহণ করে এবং আংশিক নিজেরা উৎপাদন করে) →
    - কান্ডাশ্রয়ী পরজীবী (যথা- লোরান্থাস)
    - মুলাশ্রয়ী পরজীবী (যথা- স্বর্ণলতা)

শেওলা

শেওলার সবুজকণা আছে বিধায় নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এদের দেহ মূল ও পাতায় বিভক্ত নয়। এরা সরাসরি গাছে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। তবে ছত্রাকের সঙ্গে জন্মে পাতা, কান্ড ও ডালপালায় ছোট ছোট দাগ সৃষ্টি করে সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটায়। সিফালিউরস নামে এক প্রকার শেওলা ছত্রাকের সঙ্গে জন্মে আম ও চা গাছের পাতার উপরিভাগে কালো বর্ণের আচ্ছাদন সৃষ্টি করে সালোকসংশ্লেষণে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটায়।

ভাইরাস

ভাইরাস অতি আণুবিক্ষণিক গোলাকৃতি, দন্ডাকৃতি, সুতাকৃতি, বহুভুজাকৃতি সংক্রমণাক্তক এক প্রকার নিউক্লিওপ্রোটিন। অর্থাৎ ভাইরাস কণা নিউক্লিইক এসিড (ডি.এন.এ অথবা আর.এন.এ) ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ভাইরাসের সংক্রামক অংশ হচ্ছে এর ডি.এন. এ বা আর.এন.এ. অণু। প্রোটিন এ নিউক্লিক এসিডকে আবৃত করে রাখে ও ভাইরাস কণাকে আকৃতি প্রদান করে। প্রোটিন অংশের কোনো সংক্রামক ক্ষমতা নেই। ভাইরাস বাধ্যতাম লক পরজীবী এবং জীবে রোগ সৃষ্টি করে। প্রোটোপ্লাজমের মতো ভাইরাসও সক্রিয় এবং পোষক কোষে অবিকল প্রতিরূপ পুনরুৎপাদন করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে কোষ বা প্রোটোপ্লাজমসম্পন্ন জীবদের ন্যায় দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি না করে ভাইরাস পোষক কোষের সহায়তায় প্রতিলেপন পদ্ধতিতে প্রজনন কার্য সম্পাদন করে। জড় পদার্থে কখনো কোনো অবস্থাতেই প্রজনন ঘটে না। এসব গুণাবলীর জন্য ভাইরাসকে জীব বলে মনে করা হয়। ভাইরাসে আবার জড় পদার্থের অনেকগুলো গুণ আছে। ভাইরাস নিউক্লিওপ্রোটিনের স্ফটিক, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং কোষের বাহিরে কোনো প্রকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই এদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখা যায়। ভাইরাসের কলেবর বৃদ্ধি ঘটে না এবং এদের বিভাজনও ঘটে না; শ্বসন ও বিপাক হয় না। এসব গুণের জন্য ভাইরাসকে জীব বলা যায় না। এককথায় জীবন্ত কোষে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ অতি আণুবীক্ষণিক রোগ সংক্রমণকারী নিউক্লিওপ্রোটিন কণিকাকে ভাইরাস বলা হয়।

> প্রোটোপ্লাজমের মতো ভাইরাসও সক্রিয় এবং পোষক কোষে অবিকল প্রতিরূপ পুনরুৎপাদন করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

উদ্ভিদ রোগের অজীবীয় কারণ

অজীবীয় কারণগুলোর কোনো প্রাণ নেই। জমিতে খাদ্যোপাদান ও বৃদ্ধির উপযোগী উপাদানের আধিক্য বা ঘাটতি থাকলে, আবহাওয়া ও পরিবেশ গাছ বৃদ্ধির উপযোগী না থাকলে গাছে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। অজীবীয় কারণসমূহ হলো-

> জমিতে খাদ্যোপাদান ও বৃদ্ধির উপযোগী উপাদানের আধিক্য বা ঘাটতি থাকলে এবং আবহাওয়া ও পরিবেশ গাছ বৃদ্ধির উপযোগী না থাকলে গাছে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে।

মাটি- মাটির গঠন, আর্দ্রতা, অম্লতা ও ক্ষারত্ব, জৈব বিষ, পুষ্টির অসাম্যতা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। তাই মাটিতে এসবের ঘাটতি বা আধিক্য দেখা দিলে গাছ রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

আবহাওয়া- বায়ুর আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, গতিবেগ; আলোর পরিমাণ, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, তুষার ঝড়, বরফ ইত্যাদি আবহাওয়াজনিত উপাদান। এসব উপাদানের তারতম্য হলেই গাছে রোগের প্রকোপতা বাড়ে বা কমে।

দূষিত বায়ুমন্ডল- শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস, ধোয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বায়ুমন্ডলকে দ ষিত করে গাছের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটায় এবং গাছ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে না।

রাসায়নিক পদার্থ- ছত্রাকনাশক, কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতি পরিবেশকে দ ষিত করে গাছের বৃদ্ধিকে ব্যহত করতে পারে।

উদ্ভিদ রোগের বিস্তার

উদ্ভিদ রোগ বিভিন্ন মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। বীজ, মাটি অথবা উদ্ভিদের অংশবিশেষ, পানি, বায়ু, পশুপক্ষি, কীটপতঙ্গ, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, এমনকি মানুষও নিজে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন

প্রকারের উদ্ভিদের মাধ্যমে রোগ উৎপাদক একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একদেশ থেকে অন্যদেশে, দুরদ রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

দিগন্তের সমান্তরালে যে বায়ু চলাচল করে তা রোগ উৎপাদক বিস্তারে (বিশেষ করে ছত্রাক স্ফোর) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুর গতি ও প্রকৃতির ওপর স্ফোরের বিস্তার নির্ভর করে। কারণ, স্ফোরধারক থেকে স্ফোর মুক্ত হওয়ার পর বায়ুর মাধ্যমেই এটি বিভিন্ন স্থানে দ রদ রান্ে ছড়িয়ে পড়ে।

সাধারণত মৃত্তিকাস্থিত রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের পরিত্যক্ত অংশসমূহের মাধ্যমে রোগ উৎপাদক রোগদ ষিত এলাকা থেকে রোগমুক্ত এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি এমনকি পায়ের জুতোও একস্থান থেকে অন্যস্থানে মাটি স্থানান্তরিত করে রোগ উৎপাদক বিস্তারে সাহায্য করে। অনেক সময় মাটির ক্ষয়সাধনের দ্বারা রোগ উৎপাদক বিভিন্ন স্থানে ছড়ায়। রোগদ ষিত জমি থেকে সংগৃহীত গাছ গাছড়ার শিকড়, শল্ককন্দ, স্ফীতকন্দ প্রভৃতির সঙ্গে মাটির যে সকল কণা লেগে থাকে তাদের মাধ্যমেও রোগ উৎপাদক একস্থান থেকে অন্যস্থানে অতি সহজে বিস্তারলাভ করে থাকে।

বীজ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। বীজের ওপরে ও ভিতরে রোগজীবাণু বেঁচে থাকে। ঐ বীজ বপনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে রোগ দেখা দেয়।

বীজ রোগবিস্তারে সাহায্য করে। বীজের ওপরে ও ভিতরে রোগজীবাণু বেঁচে থাকে। ঐ বীজ বপনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে রোগ দেখা দেয়। প্রকৃত বীজ ছাড়া গাছের যে সকল অংশ (যথা- মূল, শল্ককন্দ, স্ফীতকন্দ ইত্যাদি) রোপণ করে ফসল উৎপাদন করা হয় তাদের মাধ্যমেও রোগ জীবাণু বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

পানি রোগ জীবাণু বিস্তারের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে অনেক ছত্রাকের স্ফোর মুক্ত হতে পারে না। বৃষ্টি, বায়ুর আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও এরা সরাসরি রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। বৃষ্টির ফোঁটা যখন গাছের পাতা, কান্ড ও মাটিতে অবস্থিত ছত্রাক স্ফোর বা ব্যাকটেরিয়ার ওপর পড়ে তখন এরা চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে পার্শ্ববর্তী গাছের সুস্থ পাতা ও কান্ডে রোগ উৎপন্ন করে। চলন্ত বা সেচের পানি, বৃষ্টির পানি, খালবিল ও নদীর পানি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে এবং এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে প্রবাহিত হওয়ার সময় রোগজীবাণু বহন করে আনে ও রোগ উৎপন্ন করে। সাধারণত কৃমি, ব্যাকটেরিয়া ও সঞ্চরণশীল স্ফোর উৎপাদনকারী ছত্রাক এভাবে বিস্তারলাভ করে।

কীটপতঙ্গ রোগ বিস্তারের অন্যতম প্রধান সহায়ক। অনেক সময় জীবাণু পতঙ্গের শরীরে আটকে যায়। ঐ পতঙ্গ যখন খাদ্যের অন্বেষণে অন্য গাছে যায় তখন রোগজীবাণু এদের শরীর হতে ঐ গাছে স্থানান্তরিত হয়ে রোগ উৎপন্ন করে।

কীটপতঙ্গ রোগ বিস্তারের অন্যতম প্রধান সহায়ক। অনেক সময় জীবাণু পতঙ্গের শরীরে আটকে যায়। ঐ পতঙ্গ যখন খাদ্যের অন্বেষণে অন্য গাছে যায় তখন রোগজীবাণু এদের শরীর হতে ঐ গাছে স্থানান্তরিত হয়ে রোগ উৎপন্ন করে। অনেক সময় পতঙ্গ ছত্রাক স্ফোর খেয়ে ফেলে ও পরে এর মাধ্যমে স্েপ্র অন্যান্য গাছে স্থানা রিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষতের মধ্য দিয়ে গাছের দেহে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। মৌমাছি অনেক সময় মুখে ও পায়ে ব্যাকটেরিয়া বহন করে থাকে। পরে মধু আহরণের সময় এরা বিভিন্ন ফুলের মঞ্জুরীতে ব্যাকটেরিয়া স্থানান্তরিত করে রোগ বিস্তার করে থাকে। ভাইরাস রোগ বিস্তারে পতঙ্গের ভূমিকা অপরিসীম। যেসব ভাইরাস যান্ত্রিক উপায়ে স্থানান্তরিত করা যায় না সেসব

ভাইরাস স্থানান্তরে পতঙ্গ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত জাবপোকা, লিফহপার, থ্রিপস, শেতাঙ্গ মাছি, বিটল এবং গ্রাসহপার ভাইরাস বিস্তারে সাহায্য করে থাকে।

মানুষ তার প্রয়োজনে বীজ, চারাগাছ, বড়গাছ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে দূরদ রান্তে বহন করার সময় ঐসবের সঙ্গে নানাবিধ রোগজীবাণ ও স্থানান্তরিত

অনেক পাখি রোগদূষিত পোকা খেয়ে রোগজীবাণু অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। পাখির পালকে স্পোর আটকিয়েও স্পোর ছড়াতে পারে। খরগোশ, ইঁদুর প্রভৃতি লোমযুক্ত জন্তুর লোমের সঙ্গে রোগজীবাণু বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়ে সুস্থ গাছে রোগ সংক্রমণ করতে পারে। অনেক স্থানে নতুন রোগ সৃষ্টির জন্য প্রধাণত মানুষ দায়ী। যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ তার প্রয়োজনে বীজ, চারাগাছ, বড়গাছ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে দূরদ রান্তে বহন করার সময় ঐসবের সঙ্গে নানাবিধ রোগজীবাণ ও স্থানান্তরিত করে রোগ বিস্তার করে থাকে। মূলত মানুষ প্রায়ই ভালোর সঙ্গে মন্দ বহন করে আনে।

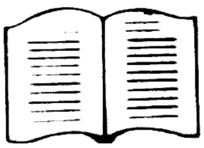

সারমর্ম ঃ উদ্ভিদ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণ প্রকাশের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি হয় এজন্য কিছু কিছু জীবীয় কারণ (যথা- পাইম মোল্ড, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, পরগাছা, মাইকোপ্লাজমা), কিছু কিছু অজীবীয় কারণ (যথা- মাটি, আবহাওয়া, রাসায়নিক পদার্থ, দূষিত বায়ুমন্ডল) ও ভাইরাস বিশেষভাবে জড়িত। বীজ, মাটি, পানি, বায়ু, পশুপক্ষি, কীটপতঙ্গ, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্র পাতির মাধ্যমে এসব রোগ উৎপাদক ছড়িয়ে বিভিন্ন স্থানে রোগ বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে কোন্ কারণে?
- ক) গাছের কিছু অংশ কেটে ফেললে
- খ) গাছকে একস্থান থেকে উঠিয়ে অন্যস্থানে লাগালে
- গ) গাছের উপর রোগ উৎপাদক পড়লে
- ঘ) গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথষ্ক্রিয়ার ফলে

২। ছত্রাক বলতে কী বুঝায়?
- ক) এককোষী জলজ উদ্ভিদ
- খ) বহুকোষী উদ্ভিদ
- গ) মূল, কান্ড ও পাতাবিহীন উদ্ভিদ
- ঘ) মূল, কান্ড, পাতা ও সবুজ কণাবিহীন উদ্ভিদ

৩। ভাইরাস বলতে কী বুঝায়?
- ক) রোগ সৃষ্টিকারী এককোষী উদ্ভিদ
- খ) রোগ সৃষ্টিকারী এককোষী সবুজকণাবিহীন উদ্ভিদ
- গ) রোগ সৃষ্টিকারী বহুকোষী সবুজ কণাবিহীন উদ্ভিদ
- ঘ) রোগ সৃষ্টিকারী অতি ক্ষুদ্রতম সংক্রমনাত্তক নিউক্লিওপ্রোটিন

৪। উদ্ভিদ রোগ বিস্তারের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কোন্টি?
- ক) মাটি
- খ) পানি
- গ) বায়ু
- ঘ) বীজ

৫। ভাইরাস রোগ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কোন্টি?
- ক) পতঙ্গ
- খ) পাখি
- গ) মানুষ
- ঘ) পানি

৬। দূরদ রান্তে রোগ বিস্তারে সাহায্য করে কোন্টি?
- ক) পাখি
- খ) মানুষ
- গ) পতঙ্গ
- ঘ) পানি

পাঠ ১.২ উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- উদ্ভিদ রোগের লক্ষণকে কতভাগে বিভক্ত করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- উদ্ভিদ রোগের বিভিন্ন লক্ষণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

রোগের লক্ষণ

ফসলের নানাবিধ রোগের লক্ষণ প্রতিদিনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু রোগের লক্ষণ বলতে আমরা কী বুঝি? সাধারণ অবস্থায় গাছ পূর্ণবিকশিত হওয়ার জন্য দেহাভ্যন্তরে জীবনের স্বাভাবিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়। ঐ কাজগুলো সর্বদাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলে। এ সমতায় বিঘ্ন ঘটলেই রোগের সূত্রপাত হয়। একটি গাছের কোনো অংশ রোগাক্রান্ত হলে ঐ অংশের কোষগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে এবং গাছে রোগের আনুষাঙ্গিক লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথক্রিয়ার ফলে গাছে যে বিকৃত ধরনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে তার ফলে গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে বিকৃতির চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। আসলে লক্ষণ রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

> গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথক্রিয়ার ফলে গাছে যে বিকৃত ধরনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে তার ফলে গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে বিকৃতির চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা

উদ্ভিদ রোগের লক্ষণের শ্রেণিবিভাজন

উদ্ভিদের লক্ষণগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

- নেক্রোটিক লক্ষণ (Necrotic Symptom)
- হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ (Hyperplastic Symptom)
- হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ (Hypoplastic Symptom)

নেক্রোটিক লক্ষণ

উদ্ভিদ বা কলার মৃত্যুজনিত লক্ষণকে নেক্রোটিক লক্ষণ বলে। গাছে আক্রান্ত অংশের মৃত কলা বা টিস্যু পচে বাদামি রঙ ধারণ করাকে নেক্রোসিস (Necroses) বলে। নেক্রোসিসের দরুন গাছের ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং নানা প্রকারের দাগ উৎপন্ন হয়। নেক্রোসিসজনিত কতকগুলো লক্ষণ নিচে বর্ণনা করা হলো।

দাগ (Spot) ঃ নেক্রোসিসের জন্য বিভিন্ন আকৃতি ও রঙের দাগ হয়। কোনো কোনো দাগের চারিদিকে হলুদ রঙের বলয় দ্বারা ঘেরা থাকে (যথা- ধান গাছের বাদামি দাগ রোগ)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাগগুলো সীমিত প্রকৃতির এবং বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার। কখনো কখনো দাগগুলো পরস্পরের সাথে মিশে বড় দাগ সৃষ্টি করতে পারে। দাগ সাধারণত হালকা থেকে গাঢ় বাদামি রঙের ও শুকনো প্রকৃতির হয়। তবে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে ভেজা ধরনের দাগও হতে পারে। অনেক সময় দাগের বাহির ও ভিতরের দিকে বিভিন্ন রঙ হয়। কিছু রোগে দাগের ভিতরের অংশ খসে পড়ে ছিদ্রওয়ালা দাগ সৃষ্টি করে থাকে এবং লক্ষণকে 'শট হোল' বলা হয়। যথা- বিট ও পুঁই গাছের *Cercospora* জনিত রোগ। (চিত্র ৫কঃ ১,২,৩ দেখুন)

> পাতা ও কান্ডে লোহার মরিচার মতো লালচে রঙের দাগ হয়। এ দাগকে পস্টিউল (Postule) বলে।

মরিচা (Rust) ঃ পাতা ও কান্ডে লোহার মরিচার মতো লালচে রঙের দাগ হয়। এ দাগকে পস্টিউল (Postule) বলে। (চিত্র ৫কঃ ৯ দেখুন)

ব্লাইট (Blight) ঃ গাছের পাতা, ফুল, কান্ড বা কান্ডের অংশ বিশেষের দ্রুত মৃত্যু হওয়াকে ব্লাইট বা মড়ক বলে। আক্রান্ত অংশ অনেকটা পোড়ার মতো মনে হয়। যথা- ধানের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট, আপেলের ফায়ার ব্লাইট রোগ। অনেক সময় মৃত অংশ পচে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। যথা- আলুর লেইট ব্লাইট রোগ। (চিত্র ৫কঃ ৬ দেখুন)

ক্যাঙ্কার (Canker) ঃ এ রোগে গাছের ছাল বা বাকল নষ্ট হয়ে কান্ডের ভিতরের কাঠ বের হয়ে আসে। সাধারণত ক্ষতের চারপাশে ‘ক্যালাস’জাতীয় বিশেষ কলার সৃষ্টি হয়ে কিছুটা উঁচু হয়ে ওঠে। যথা- গোলাপের ক্যাঙ্কার রোগ। (চিত্র ৫খঃ ১০ দেখুন)

ডাইব্যাক বা আগা মরা (Die back) ঃ এ রোগে গাছের শাখা ও উপশাখা আগা থেকে আরম্ভ করে নিচের দিকে শুকিয়ে আসতে থাকে। যথা- লেবু গাছের ডাইব্যাক বলে। (চিত্র ২৮ দেখুন)

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose) ঃ গাছের কান্ড, পাতা বা ফলে বসে যাওয়ার মতো দাগ হয় এবং দাগের মধ্যে কালো কাঁটার মতো ছত্রাকের এসারভুলাস (acervulus) দেখা যায়। যথা- *Colletotrichum* আক্রান্ত জনিত পাট, আম, মরিচের দাগ। (চিত্র ২২ দেখুন)

ড্যাম্পিং অফ বা নেতিয়ে পড়া (Damping off) ঃ বীজতলায় চারার কান্ডে মাটিসংলগ্ন স্থানে কোষ নরম হয়ে যায়। ফলে ভার বহন করতে না পেরে চারা মাটিতে নেতিয়ে পড়ে মরে যায়। *Pythium, Rhizoctonia* প্রভৃতির আক্রমণে এ রোগ হয়।

ঢলে পড়া (Wilting) ঃ রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক সময় গাছের পাতা ও ডালপালা পানির স্বল্পতার দরুন নুয়ে পড়ে। এ রোগে দিনের বেলায় নিচের দিকের কয়েকটি পাতা নেতিয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় আবার স্বাভাবিক সতেজ অবস্থায় ফিরে আসে। ক্রমশ নেতিয়ে পড়াটা স্থায়ী হয় এবং আরও উপরের দিকের পাতায় এ লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। নেতানো পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যায় বা ঝরে পড়ে। *Fusarium* ও *Verticillium* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। (চিত্র ৫কঃ ৪ দেখুন)

গামোসিস (Gumosis) ঃ এ রোগে ক্ষতস্থান থেকে আঁঠা নির্গত হয়। এ আঁঠা ক্ষতস্থানের চারপাশে শক্ত হয়ে যায়। যথা- *Phytophthora* জনিত লেবু গাছের আঁঠা ঝরা রোগ।

আক্রান্ত অংশের কোষ পচে নষ্ট হওয়াকে পচন বলে। পচা অংশ সর্বদা ভেজা ও পিচ্ছিল থাকলে নরম পচা এবং পচা অংশ বাদামি রঙ ধারণ করে শুকিয়ে ঝুরঝুরা হলে শুকনো পচা বলে।

পচন (Rot) ঃ আক্রান্ত অংশের কোষ পচে নষ্ট হওয়াকে পচন বলে। পচা অংশ সর্বদা ভেজা ও পিচ্ছিল থাকলে নরম পচা এবং পচা অংশ বাদামি রঙ ধারণ করে শুকিয়ে ঝুরঝুরা হলে শুকনো পচা বলে (চিত্র ৩৮)। আলুর *Erwinea* ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নরম পচা ও *Fusarium* নামক ছত্রাক দ্বারা শুকনো পচা রোগ হয়।

গুড়ি পচা (Foot rot) ঃ এ রোগে গাছের গোড়ার দিকটা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাদামি-কালচে রঙের পচা দাগ উৎপন্ন করে। এর ফলে গাছ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে। যথা- ধানের গুড়ি পচা রোগ। (চিত্র ৫খঃ ১৪ দেখুন)

পাউডারী মিলডিউ (Powdery mildew) ঃ এ রোগে পাতার ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাদা দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত অংশ সাদা খড়িমাটির গুড়োর মতো মনে হয়। রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সাদা রঙ বাদামি হয়ে আসে। যথা- ধান, কুমড়া ও লাউয়ের পাউডারি মিলডিউ রোগ।

অস্বাভাবিক কোষ বিভক্তির ফলে কোষের সংখ্যা, আকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গাছের বিভিন্ন অংশ ফুলে ওঠাকে হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ বলে।

হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ (Hyperplastic symptom)

অস্বাভাবিক কোষ বিভক্তির ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অথবা কোষের আকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির ফলে গাছের বিভিন্ন অংশ ফুলে ওঠাকে হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ বলে। এখানে কয়েকটি হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

স্ক্যাব (Scab)ঃ এ রোগে গাছের ত্বক ফেটে মামড়ি পড়ার মতো হয়ে খসখসে হয়। যথা- *Streptomyces* জনিত আলুর পাউডারী স্ক্যাব রোগ। (চিত্র ৫খঃ ১৩ দেখুন)

চিত্র ৫ ক ঃ উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ
১-৩ বিভিন্ন প্রকারের দাগ, ৪- ঢলে পড়া, ৫- শিকড় গিঁট,
৬- ব্লাইট, ৭- পাতা গুটানো, ৮- পাকারিং ও ৯- মরিচা।

গল (Gall) ঃ রোগাক্রান্ত অংশের কোষ দ্রুত বিভক্তির ফলে স্ফীত হয়ে গল সৃষ্টি হয়। যথা- *Agrobacterium* এর আক্রমণে টমেটো গাছে গল হয়। (চিত্র ৫খঃ ১২ দেখুন)

শিকড় গিঁট (Witches broom) ঃ আক্রান্ত অংশ গলের ন্যায় ফুলে ওঠে বা স্ফীত হয়। তবে এখানে কোষের দ্রুত বিভক্তির ফলে ফুলে ওঠে না, আক্রান্ত কোষটিই অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে স্ফীত হয়ে গল সৃষ্টি করে। যথা- *Meloidogyne* নামক কৃমির আক্রমণে অনেক গাছের শিকড়ে এ ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হয়। (চিত্র ৫কঃ ৫ দেখুন)

উইচেস ব্রুম বা ডাইনির ঝাঁটা ঃ এ রোগে কান্ডের আগায় ঘন ঘন উর্দ্ধমুখী শাখা উৎপন্ন হয়ে ঝাঁটার আকার ধারণ করে। এসব শাখার গায়ে ছোট ছোট স্ফীত ধরনের পাতাও থাকতে পারে। আম গাছে এ ধরনের লক্ষণ হতে দেখা যায়।

পাশাপাশি অঙ্গসমূহ একত্রে বৃদ্ধি পেয়ে চ্যাপটা আকার ধারণ করাকে ফ্যাসিয়েশন বলে।

ফ্যাসিয়েশন ঃ পাশাপাশি অঙ্গসমূহ একত্রে বৃদ্ধি পেয়ে চ্যাপটা আকার ধারণ করাকে ফ্যাসিয়েশন বলে। যথা- মাইকোপ্লাজমাজনিত কলাগাছের গুচ্ছ মাথা রোগ।

পাতা গুটানো ঃ অনেক সময় পাতার উপর তলের তুলনায় নিচের তলের বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় পাতা কিনারা বরাবর উপরের দিকে গুটিয়ে যায়। পাতার এ ধরনের গুটিয়ে যাওয়া লক্ষণকে লিফরোল বলে। যথা- টমেটো গাছের লিফরোল রোগ। (চিত্র ৫কঃ ৭ ও চিত্র ৩৭ দেখুন) সাধারণত ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়।

কোষ বিনষ্ট বিভাজনের মন্থরতার দরূনে গোটা গাছ বা কোনো অংশের বৃদ্ধির মন্থরতার ফলে

হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ

কোষ বিনষ্ট হওয়ার ফলে অথবা কোষ বিভাজনের মন্থরতার দরুন গোটা গাছের বা কোনো অংশের বৃদ্ধির মন্থরতার ফলে যে লক্ষণ দেখা দেয় তাকে হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ বলে। নিচে কয়েকটি হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণের সংজ্ঞা দেয়া হলো।

ক্লোরোসিস ঃ রোগে আংশিকভাবে সবুজ কণা গঠিত না হওয়ার দরুন গাছের বিভিন্ন অংশে স্বাভাবিক সবুজ রঙ না হওয়াকে ক্লোরোসিস বলে। যথা- ভাইরাসের আক্রমণে পাতার স্বাভাবিক সবুজ রঙ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিবর্ণ হয়ে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

পাতায় গাঢ় ও হালকা সবুজ, হলুদ ও সময় সময় সাদা বর্ণের টিস্যু পাশাপাশি থেকে যখন ডিজাইন করার মতো টিস্যু সৃষ্টি হয় তখন তাকে মোজাইক বলে।

মোজাইক ঃ পাতায় গাঢ় ও হালকা সবুজ, হলুদ ও সময় সময় সাদা বর্ণের টিস্যু পাশাপাশি থেকে যখন ডিজাইন করার মতো টিস্যু সৃষ্টি হয় তখন তাকে মোজাইক বলে। তামাক, শশা, কুমড়া প্রভৃতি গাছে ভাইরাসের আক্রমণে এ ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায় (চিত্র ৫খঃ ১১ দেখুন)।

ডশরাস্বচ্ছতা ঃ পাতার শিরা ও উপশিরায় সবুজ রঙ নষ্ট হয়ে গেলে স্বচ্ছ হয়ে এ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়। যথা- লেটুসের ‘বিগ ভেইন’ রোগ।

পাতার উপর গাঢ় ও হালকা সবুজ বা হলুদ রঙের ফুটফুট দাগ পড়াকে মটলিং বলে।

মটল বা ছিটে দাগ ঃ পাতার উপর গাঢ় ও হালকা সবুজ বা হলুদ রঙের ফুটফুট দাগ পড়াকে মটলিং বলে। ভাইরাসের আক্রমণে এ ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হয়। যথা- আমের মোজাইক রোগ।

পাকারিং ঃ এ লক্ষণজনিত রোগে পাতার শিরাউপশিরার মধ্যস্থলের টিস্যু স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে অনুপাতে শিরাউপশিরা গঠিত হয় না। এর ফলে, পাতার গায়ে ঢেউয়ের মতো ভাঁজ সৃষ্টি হয়। ভাইরাসের আক্রমণে টমেটো এবং আরও অনেক গাছে এ লক্ষণ হতে দেখা যায় চিত্র ৫কঃ ৮ দেখুন)।

বামনত্ব ঃ গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে খর্বাকৃতি হয়ে এ লক্ষণ সৃষ্টি করে। ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়।

রোজেটিং ঃ গাছের আগার দিকে পর্বমধ্য স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পেয়ে সে স্থানে অনেক পাতা একস্থানে স্বচ্ছাকারে অবস্থান করে এ লক্ষণ সৃষ্টি করে এবং গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো মনে হয়।

চিত্র ৫খ ঃ উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ
১০- ক্যাঙ্কার, ১১- মোজাইক, ১২- গল, ১৩- স্ক্যাব,
১৪- গুড়ি পচা ও ১৫- পাউডারি মিলডিউ

সারমর্ম ঃ লক্ষণ রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রোগের লক্ষণগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- নেক্রোটিক লক্ষণ, যথা- পাউডারি মিলডিউ, ডাউনি মিলডিউ, ব্লাইট, ক্যাঙ্কার, এনথ্রাকনোজ, বিভিন্ন প্রকারের দাগ পড়া, ঢলে পড়া প্রভৃতি; হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ, যথা- স্ক্যাব, গল, শিকড় গিট, উইসেচ ব্রুম, ফ্যাসিয়েশান, পাতাগুটানো প্রভৃতি এবং হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ, যথা- মোজাইক, ক্লোরসিস, পাকারিং, রোজেটিং, বামনত্ব প্রভৃতি।

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। উদ্ভিদ কোষ বা কলার মৃত্যুজনিত লক্ষণ কোন্‌টি?
- ক) ক্যাঙ্কার
- খ) মোজাইক
- গ) গল
- ঘ) পাকারিং

২। গাছের পাতা, ফুল, কান্ড ও কান্ডাংশের দ্রুত মৃত্যু হওয়াকে কী বলে?
- ক) ক্যাঙ্কার
- খ) ডাইব্যাক
- গ) ড্যাম্পিং অফ
- ঘ) ব্লাইট

৩। কোন্ রোগে ক্ষতস্থানে কান্ডের কাঠ বের হয়ে আসে?
- ক) এনথ্রাকনোজ
- খ) ব্লাইট
- গ) ক্যাঙ্কার
- ঘ) স্ক্যাব

৪। পাশাপাশি অঙ্গসমূহ একত্রে থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চ্যাপ্টা আকার ধারণ করাকে কী বলে?
- ক) রোজেটিং
- খ) উইচেস ব্রুম
- গ) ফ্যাসিয়েশন
- ঘ) পাকারিং

৫। উদ্ভিদ রোগের লক্ষণসমূহকে প্রধানত কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?
- ক) দু'ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

পাঠ ১.৩ উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিভাগ

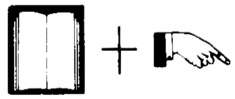

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদ্ভিদ প্রকারের ওপর ভিত্তি করে রোগকে কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কারণের ওপর ভিত্তি করে রোগকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবেন।
- লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে রোগকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবেন।
- উৎস, সংঘটন, বিস্তার ও সংক্রমণের প্রকৃতি অনুযায়ী রোগকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবেন।

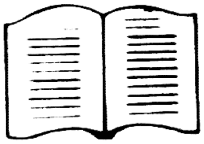

উদ্ভিদ প্রকারভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন

অনেকে গাছের প্রকৃতি অনুযায়ী রোগকে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এ পদ্ধতিতে একই ধরনের শস্যের রোগকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়। যথা- ফসলের রোগ, শাকশজির রোগ, ডালের রোগ, ফল গাছের রোগ, বনবৃক্ষের রোগ, ফুল গাছের রোগ, দারুবৃক্ষের রোগ, শোভা বর্দ্ধক গাছের রোগ, ওষধি গাছের রোগ ও বন্য গাছের রোগ।

উল্লিখিত প্রত্যেক শ্রেণির রোগকে আবারও ভাগ করা যায়। যথা- ফসলের রোগকে দানা শস্যের রোগ, পশু খাদ্য শস্যের (forage) রোগ, আঁশজাতীয় শস্যের রোগ ইত্যাদি। এসব শ্রেণির প্রত্যেকটি রোগকে আবারও ভাগ করা যায়। যথা- দানা শস্যকে ধানের রোগ, গমের রোগ, ভুট্টার রোগ, যবের রোগ, বার্লির রোগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শস্যের নাম অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

কখনো কখনো গাছের আক্রান্ত অঙ্গের নাম অনুসারে রোগকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যথা- শিকড়ের রোগ, কান্ডের রোগ, পাতার রোগ, ফুলের রোগ, ফলের রোগ ইত্যাদি।

কারণভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন

কারণের ওপর ভিত্তি করে রোগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) পরজীবীজনিত রোগ এবং (২) অপরজীবীজনিত রোগ।

> প্রকৃতি অনুযায়ী পরজীবীজনিত রোগসম হকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- ছত্রাকজনিত রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, ভাইরাসজনিত রোগ, মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ, সপুষ্পক উদ্ভিদজনিত রোগ এবং কৃমিজনিত রোগ।

পরজীবীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরজীবীজনিত রোগসম হকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) ছত্রাকজনিত রোগ, (২) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, (৩) ভাইরাসজনিত রোগ (৪) মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ, (৫) সপুষ্পক উদ্ভিদজনিত রোগ এবং (৬) কৃমিজনিত রোগ।

অপরজীবীজনিত রোগকে কারণভিত্তিক ৭ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) পুষ্টির অভাবজনিত রোগ, (২) পানির স্বল্পতা ও আধিক্যতাজনিত রোগ, (৩) বায়ুর প্রতুলতা ও অপ্রতুলতাজনিত রোগ, (৪) প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত (উষ্ণতা, আর্দ্রতা, আলো ইত্যাদি) রোগ, (৫) জমির প্রতিকূল পরিবেশজনিত (অম্লতা, ক্ষারতা, খাদ্য উপাদানের ঘাটতি, লবণের প্রাচুর্যতা ইত্যাদি) রোগ, (৬) দূষিত পরিবেশজনিত (ক্ষতিকর গ্যাস ও অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতি) রোগ এবং ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতজনিত রোগ।

> লক্ষণ অনুযায়ী রোগকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) পাতায় দাগ রোগ, (২) মরিচা রোগ, (৩) নরম পচা রোগ, (৪) ঢলে পড়া রোগ, (৫) পোড়া বা ব্লাইট রোগ, (৬) নেতিয়ে পড়া রোগ এবং (৭) ঝুল রোগ।

লক্ষণভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন

বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় এবং রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ অনুযায়ী রোগকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) পাতায় দাগ রোগ, (২) মরিচা রোগ, (৩) নরম পচা রোগ, (৪) ঢলে পড়া রোগ, (৫) পোড়া বা ব্লাইট রোগ, (৬) নেতিয়ে পড়া রোগ এবং (৭) ঝুল রোগ।

উৎসভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন

উৎপত্তিস্থলের ওপর ভিত্তি করে রোগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) মৃত্তিকা বাহিত রোগ, (২) বায়ু বাহিত রোগ (৩) বীজ বাহিত রোগ এবং ভেক্টর বাহিত রোগ।

রোগ সংঘটন, বিস্তার ও সংক্রমণের প্রকৃতি অনুযায়ী রোগের শ্রেণিবিভাজন

রোগ সংঘটনের সম্বন্ধ অনুযায়ী রোগকে চার ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। যথা-

(১) এন্ডেমিক বা আঞ্চলিক রোগ (endemic disease)ঃ এ ধরনের রোগ বিশেষ স্থানে প্রায়ই অধ্যুষিত হয়। যথা- গোল আলুর ওয়ার্ট রোগ।

(২) স্পোরাডিক বা বিক্ষিপ্ত রোগ (sporadic disease)ঃ এ রোগ এখানে ওখানে অনিয়মিতভাবে দেখা দেয়। এ রোগে ক্ষতি কম হয় এবং কম অঞ্চলে সংঘটিত হয়। যথা- ধানের ফলস স্মাট রোগ।

(৩) প্যান্ডেমিক রোগ (pendemic disease)ঃ যখন রোগ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা দেয় এবং প্রচুর ক্ষতিসাধন করে তখন তাকে প্যান্ডেমিক রোগ বলা হয়। যথা- আলুর লেইট ব্লাইট রোগ।

(৪) এপিফাইটোটিক রোগ (epiphytic disease)ঃ রোগ যখন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অধ্যুষিত হয় কিন্তু মাঝে মাঝে মারাত্তক আকার ধারণ করে তখন তাকে এপিফাইটোটিক রোগ বলা হয়। যথা- ধানের ব্লাস্ট রোগ ও আলুর লেইট ব্লাইট রোগ।

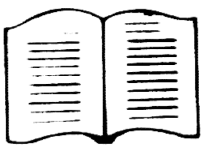

সারমর্ম ঃ উদ্ভিদ রোগসম হকে কীভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায় তা এ পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ভিদের প্রকার, যথা- শাকশবজি, ফল ও ফুল গাছ, বনবৃক্ষ, দারুবৃক্ষ, ওষধি গাছ ইত্যাদি রোগের কারণ, যথা- ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, ভাইরাস, কৃমি প্রভৃতি রোগের লক্ষণ, যথা- পাতার দাগ, মরিচা, ঢলে পড়া, নেতিয়ে পড়া, পচন, ব্লাইট প্রভৃতি রোগের উৎস, যথা- মাটি, বায়ু ও বীজ রোগ সংঘটন, যথা- বিক্ষিপ্ত, আঞ্চলিক, এপিফাইটোটিক, প্যান্ডেমিক ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের রোগকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূলায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কারণকে ভিত্তি করে রোগকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?

- ক) দু ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

২। পরজীবীর প্রকৃতি অনুযায়ী রোগকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?

- ক) দু ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

৩। উৎসের ওপর ভিত্তি করে রোগকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?

- ক) দু ভাগে
- খ) তিন ভাগে
- গ) চার ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

৪। যখন রোগ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দেখা দেয় এবং মাঝে মাঝে মারাত্তক আকার ধারণ করে তাকে কোন্ প্রকৃতির রোগ বলে?

- ক) এন্ডেমিক
- খ) স্কোরাডিক
- গ) প্যান্ডেমিক
- ঘ) এপিফাইটোটিক

পাঠ ১.৪ উদ্ভিদ রোগনাশকের শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত রোগনাশকের নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কয়েকটি রোগনাশক তৈরি করে ব্যবহার করতে পারবেন।
- রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম লিখতে পারবেন।
- রোগনাশকের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

রোগনাশকের শ্রেণিবিভাগ

রোগনাশক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য। রোগ নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক দ্রব্যই সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। রোগনাশককে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) কার্যকারিতা অনুযায়ী

(১) ফাঞ্জিসাইড ছত্রাকনাশক বা (Fungicide)ঃ ছত্রাকজনিত রোগ দমনে ব্যবহার করা হয়।

(২) ব্যাকটেরিসাইড ব্যাকটেরিয়ানাশক বা (Bactericide)- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নিয়ন্ ণে ব্যবহৃত হয়।

(৩) নেমাটিসাইড কৃমিনাশক বা (Nematicide)ঃ কৃমিজনিত রোগ দমনে ব্যবহৃত হয়।

(৪) উইডিসাইড বা আগাছানাশক (Weedicide)ঃ আগাছা ধ্বংসে ব্যবহৃত হয়।

কিছু কিছু রোগ (যথা- ভাইরাসজনিত রোগ) দমনে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক নামে আরও এক প্রকারের রাসায়নিক যৌগ আছে যা কোনো জীবাণু থেকে উৎপন্ন হয় এবং অনেক জীবাণুর জন্য ক্ষতিকর।

খ) উৎস অনুযায়ী

(১) রাসায়নিক দ্রব্য

(২) উদ্ভিদ নির্যাস

(৩) অনুজীবঘটিত অ্যান্টিবায়োটিক

রাগনাশক প্রধানত বীজ শোধন, মাটি শোধন ও সিঞ্চনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভালো রোগনাশকের কিছু কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন- র) অল্প মাত্রায় প্রয়োগেই রোগ দমনের ক্ষমতা থাকতে হবে, রর) প্রয়োগ সহজতর হতে হবে, ররর) কার্যক্ষমতা স্থিতিশীল হতে হবে, রা) মূল্য সাধারণ কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে হতে হবে এবং া) সর্বোপরি উদ্ভিদ, প্রাণি ও মানুষের তথা পরিবেশের ওপর এদের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব থাকবে না। রোগনাশক প্রধানত বীজ শোধন, মাটি শোধন ও সিঞ্চনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ) আবার, কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে রোগনাশককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-(১) প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক, (২) নিরাময়কারী রোগনাশক এবং (৩) অ্যান্টিবায়োটিক।

প্রতিরক্ষামূলক (Preventive) রোগনাশক

এগুলো রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে রোগাক্রমণের পূর্বে বা শুরুতে প্রয়োগ করা হয়। প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক অজৈব ও জৈব রাসায়নিক প্রকৃতির হতে পারে।

অজৈব রাসায়নিক রোগনাশক

তামাঘটিত অজৈব রোগনাশক

(ক) বোর্দো মিক্সচারঃ এটি খুবই জনপ্রিয় ও সবচেয়ে পুরাতন ছত্রাকনাশক। এ ওষুধ বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সাধারণত শতকরা এক ভাগ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্দো মিক্সচার গাছে ছিটাঁনো হয়।

উপকরণ

তুঁতে - ৩৫৬ গ্রাম
পাথরে চুন- ৩৫৬ গ্রাম
পানি - ৩৭ লিটার

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে একটি মাটির পাত্রে ২০ লিটার পানি নিয়ে তাতে তুঁতে গলানো হয়। অন্য আর একটি পাত্রে

অল্প অল্প পানি ঢেলে চুনকে ফুটানো হয়। সমস্ত চুন ফুটলে ঠান্ডা করে এতে বাকি পানি ঢেলে চুনকে ভালোভাবে মিশানো হয়। তারপর পাত্রে তুঁতের পানি মিশালেই বোঁর্দো মিক্সচার তৈরি হয়। বোঁর্দো মিক্সচারের আসল রঙ আকাশের মত নীল। ওষুধ ঠিকমত তৈরি হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য মিক্সচারের মধ্যে একটি ইস্পাতের ছুরি কয়েক মিনিট ডুবিয়ে দেখতে হবে তার উপর তামার কোনো গুঁড়ো জমেছে কি-না। যদি তামার গুঁড়ো জমে তাহলে তাতে আরো চুন মিশাতে হবে। বোঁর্দো মিক্সচার ঠিকমতো প্রস্তুত না করে ছিটালে গাছের ক্ষতি হয়। এ মিক্সচার তৈরি করার ১-২ ঘন্টার মধ্যেই ব্যবহার করা উচিত। শতকরা ২ ভাগ বোঁর্দো মিক্সচার প্রস্তুতের জন্য দ্বিগুণ পরিমাণ চুন ও তুঁতে ৩৭ লিটার পানিতে মিশাতে হবে।

(খ) বারগান্ডি মিক্সচারঃ আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য ভালো চুন না পাওয়া গেলে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ

তুঁতে - ৩৫৬ গ্রাম
কাপড়কাঁচা সোডা - ৪৭০ গ্রাম
পানি - ৩৭ লিটার

প্রস্তুত প্রণালী

বোঁর্দো মিক্সচারের মতোই এ ওষুধ প্রস্তুত করতে হয়। এখানে কেবল চুনের পরিবর্তে সোডা ব্যবহার করা হয়।

(গ) চেসান্ট কম্পাউন্ডঃ সাধারণত বীজতলায় চারাগাছের রোগ দমনের জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ

তুঁতে - ৫৯ গ্রাম
এমোনিয়াম কার্বোনেট - ৩২৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী

তুঁতে ও অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট মিহি করে গুঁড়ো করার পর মিশানো হয়। পরে এটি একটি বোতলে নিয়ে ভালোভাবে ছিপি আটকিয়ে ২৪ ঘন্টার জন্য বন্ধ করে রাখতে হয়। তারপর তা থেকে ৩০ গ্রাম নিয়ে ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছের গোড়ার চারিপাশে ঢেলে মাটি ভিজিয়ে দিতে হয়। মাটিতে ওষুধ ঢালার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এটি সরাসরি গাছের গোড়ায় না লাগে।

(ঘ) চৌবাত্তিয়া মলমঃ সাধারণত লেবু, আপেল, নাশপাতি প্রভৃতি ফল গাছের ডালপালা ছেঁটে কাটা স্থানে এ ওষুধের প্রলেপ দেয়া হয়।

উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী

এক লিটার তিসির তেলের মধ্যে ৮০০ গ্রাম কপার কার্বনেট এবং ৮০০ গ্রাম লাল সিসা ভালোভাবে মিশিয়ে আঠালো পেস্ট তৈরি করলে চৌবাত্তিয়া মলম হয়।

ঙে) বোঁর্দো মলমঃ এ মলমটিও চৌবাত্তিয়া মলমের ন্যায় গাছের ক্ষতস্থানে বা ডালপালা ছাটার পর কাটাস্থানে লাগাতে হয়।

উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী

এক ভাগ তুঁতে ও এক ভাগ চুন ২ ভাগ পানিতে পৃথক পৃথকভাগে গুলে মিশিয়ে বোর্দো মলম তৈরি করতে হয়।

উপরিউক্ত ওষুধগুলোর উপকরণ সামগ্রি বাজার থেকে কিনে স্থানীয়ভাবে তৈরি করা যায় বলে কৃষকরা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারেন। তবে আজকাল তামাঘটিত অজৈব ছত্রাকনাশক বিদেশের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করে বিভিন্ন নামে বাজারজাত করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কুপ্রাভিট, কপার অক্সিক্লোরাইড, পেরনক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব ওষুধ স্প্রে করে গাছে ছিটাতে হয়।

গন্ধকঘটিত অজৈব রোগনাশক

(ক) চুন মিশ্রিত গন্ধক- বোঁর্দো বা বারগান্ডি মিক্সচার ব্যবহার করলে যদি গাছের গায়ে তুঁতের দাগ পড়ে তখন এ ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

উপকরণ

পাথুরে চুন	- ৫৯০ গ্রাম
গন্ধক	- ৫৯০ গ্রাম
পানি	- ৩০ লিটার

প্রস্তুত প্রণালী

মাটির পাত্রে চুন রেখে তাতে ধীরে ধীরে পানি ঢালতে হয়। চুন পানিতে ডোবার পর যখন ফুটতে আরম্ভ করে তখন তাতে গন্ধক চূর্ণ যোগ করে ভালোভাবে নেড়ে মিশানো হয়। মিশ্রিত পদার্থকে সবসময় কাঁদার মতো নরম রাখার চেষ্টা করতে হয় এবং সেজন্য মাঝে মাঝে তাতে অল্প অল্প পানি মিশিয়ে নাড়তে হয়। চুন সম্পূর্ণরূপে ফুটে গেলে তাতে অবশিষ্ট পানি যোগ করে এ ওষুধ তৈরি করতে হয়।

(খ) গন্ধক চূর্ণঃ সাধারণত মিলডিউ রোগ দমনকল্পে এ ওষুধ গাছে ছিটানো হয়। বিভিন্ন ধরনের গন্ধক (যথা- চূর্ণ গন্ধক, দানাবাধা গন্ধক, সবুজ গন্ধক প্রভৃতি) মিহি করে গুঁড়ো করার পর ভোরের দিকে শিশিরসিক্ত অবস্থায় গাছের উপর ছিটানো হয়।

পারদঘটিত অজৈব রোগনাশক

বীজ শোধনের জন্য প্রথম পারদঘটিত দুটি অবৈজ লবণ (যথা- মারফিউরিক ক্লোরাইড ও মারফিউরাস

ক্লোরাইড) ব্যবহার করা হোত। এসব লবণ অত্যন্ত বিষাক্ত হওয়ায় এদের ব্যবহার আমাদের দেশসহ বহুদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জৈব রাসায়নিক রোগনাশক

গন্ধকঘটিত জৈব রোগনাশক

তামা, পারদ ও গন্ধকঘটিত অজৈব রোগনাশক ব্যবহারে অনেক রোগ দমনে ভালো ফল পাওয়া গেলেও এদের কিছু কিছু দোষ থাকার জন্য নিরাপদ ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা চলতে থাকে। তার ফলশ্রুতিতে নিরাপদ ও বহু গুণসম্পন্ন গন্ধকঘটিত থায়োকার্বামেট শ্রেণির অনেক জৈব ওষুধ আবিষ্কৃত হয় যেগুলো বর্তমানে বহুল প্রচলিত রোগনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। থায়োকার্বামিক এসিডে দুটি অক্সিজেন অনু গন্ধকের অনু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে ডাইথায়োকার্বামিক এসিড উৎপন্ন হয়। এ এসিডকে ব্যবহার করে অনেক ধরনের ছত্রাকনাশক (যথা- থাইরাম, জাইরাম, ফারবাম, জায়নেব, ম্যানেব, ন্যাবাম, ম্যানকোজেব ইত্যাদি) তৈরি হয়। ডাইথায়োকার্বমেটের সঙ্গে বিভিন্ন যৌগের

সংমিশ্রণে আরও কিছু কার্যকরী রোগনাশক তৈরি হয়েছে (যথা- ডায়থেন এম ৪৫)। এটি পাতার বহু রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

পারদঘটিত জৈব রোগনাশক

পারদঘটিত অজৈব রোগনাশক অত্যন্ত বিষাক্ত বলে পরবর্তীকালে পারদের বিভিন্ন জৈব যৌগ (যথা- এগ্রোসান জি এন, এরাটান, সেরেসান ইত্যাদি) প্রস্তুত করা হয় এবং প্রধানত বীজ শোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলোতে অজৈব যৌগের তুলনায় পারদের পরিমাণ অনেক কম থাকে। কিন্তু তবুও ওসব যৌগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়ায় এগুলোরও ব্যবহার অনেক দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ফসফরাসঘটিত জৈব রোগনাশক

হিনোসান ও কিটাজিন ফসফরাসঘটিত জৈব রোগনাশক। এগুলো স্প্রে করলে গাছে বিশোষিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন অংশে কিছুটা ছড়ায়। এজন্য এগুলো অনেকটা সিস্টেমিক প্রকৃতির ওষুধ।

টিনঘটিত জৈব রোগনাশক

ব্রেস্টান, ব্রেস্টানল, ডিউটার টিনঘটিত জৈব রোগনাশক। এগুলো গাছের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে বলে এদের কর্যকারিতা ভালো কিন্তু পাতার ক্ষতি করে বিধায় এদের ব্যবহার কিছুটা সীমিত।

নাইট্রোজেনঘটিত রোগনাশক

ক্যাপটান, ডাইফোলাটান উলে-খযোগ্য নাইট্রোজেনঘটিত রোগনাশক। ক্যাপটান বীজশোধন ও মাটি শোধনে ব্যবহৃত হয় এবং ডাইফোলাটান অনেক রোগের জন্য গাছে ছিটানো হয়।

বেঞ্জিনযুক্ত রোগনাশক

ব্রাসিকল, ক্যারাথেন বা ডাইনোক্যাপ, ডেক্সন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বেঞ্জিনযুক্ত রোগনাশক। এরা সুগন্ধিযুক্ত যৌগ। ব্র্যাসিকল বীজ শোধনে ও মাটি ভেজানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ডেক্সন ড্যাম্পিংঅফ রোগের জীবাণু দমনে মাটিতে এবং ক্যারাথেন পাউডারি মিরডিউ রোগ দমনে পাতায় ব্যবহার করা হয়।

কুইনোনজাতীয় রোগনাশক

স্পারগন, ফাইগন কুইনোনজাতীয় রোগনাশক। স্পারগন এবং ফাইগন বীজ শোধনে স্প্রে করে ব্যবহার করা হয়।

নিরাময়কারী রোগনাশক

উপরে বর্ণিত রোগনাশকগুলো গাছ বিশোষণ করে না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা করলেও তা সর্বাঙ্গে ছড়ায় না। সাধারণত এগুলো স্থানীয় ভিত্তিতে কাজ করে। এগুলো গাছের রোগের আক্রমণ কমায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আক্রান্ত গাছকে রোগমুক্ত করে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিছু কিছু রোগনাশক আছে যা গাছে বিশোষিত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের দেহের মধ্যে জীবাণু থাকলে অথবা প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাকে ধ্বংস করে এবং রোগ নিরাময় করে গাছকে সুস্থ করে। নিরাময়কারী রোগনাশক সিস্টেমিক বা সর্বাঙ্গবাহী। অক্সাথিন, পিরামিডিন ও বেঞ্জিমিডাজোল শ্রেণির যৌগ সিস্টেমিক প্রকৃতির।

অক্সাথীন জাতীয় যৌগঃ ভিটাভ্যাক্স ও প্লান্টভ্যাক্স অক্সাথিন শ্রেণির রোগনাশক। এগুলো দিয়ে গম, যব, ভুট্টার বীজ শোধন করলে তার মধ্যস্থিত ছত্রাক ধ্বংস হয়ে লুজ স্মাট রোগ নিয়ন্তিত হয়। ভিটাভ্যাক্স লোহার (iron) সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বেঞ্জিমিডাজোলজাতীয় যৌগঃ বেনোমিল এবং ব্যাভিস্টিন বহুল প্রচলিত বেঞ্জিমিডাজোলজাতীয় রোগনাশক। এসব ওষুধ বীজ শোধন, মাটি শোধন, গাছের গোড়া ও পাতায় ছিটিয়ে ব্যবহার করা যায়। টপসিন নামে আর একটি যৌগ আছে যা বোনোমিলের ন্যায় কার্যকর।

পিরিমিডিনজাতীয় যৌগঃ মিলকার্ব, মিলটেক্স পিরিমিডিন শ্রেণির উল্লেখযোগ্য যৌগ। এগুলো বীজ শোধনে ব্যবহৃত হয়।

অ্যান্টিবায়োটিক রোগনাশক

অ্যান্টিবায়োটিক অণুজীব থেকে উৎপন্ন এক প্রকার দ্রব্য যা অন্যান্য অনুজীবের ক্ষতিকারক। সিস্টেমিক

রোগনাশকের ন্যায় এটিও সর্বাঙ্গীয় প্রকৃতির। তবে এটি অত্যন্ত দ্রুত সর্বাঙ্গে ছড়াতে সক্ষম। মানুষ ও জীবজন্তুর রোগ নিরাময়ে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ থাকলেও গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের ওষুধ অল্প কয়েকটি আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা- স্ট্রেপটোমাইসিন, এগ্রিমাইসিন, এক্টিডাওন, ব্লাস্টিসিডিন, কাসুমিন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক রোগনাশক।

উদ্ভিদ নির্যাস

কিছু কিছু উদ্ভিদের নির্যাসে জীবাণুনাশক ও রোগনাশক দ্রব্যগুণ উচ্চমাত্রায় রয়েছে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- কাঁচা রসুনের রস ও লবঙ্গের নির্যাস তেল যথাক্রমে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ করে বীজ শোধনে চমৎকার কার্যকর।

বিবিধ রোগনাশক

বর্তমানে আরও অনেক প্রকারের রোগনাশক আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে রিডোমিল, রোভরাল, টিলেক্স বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও বেশ কিছু কীটনাশক (যথা- নেমাগন, ভ্যাপাম, মাইলোন, জিনোফস, ডাউফিউম প্রভৃতি) কৃমিজনিত রোগ দমনে ব্যবহৃত হয়। জীবাণু ধ্বংস করে মাটিকে নির্বিজন বা জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরোপিকরিন, মিথাইল ব্রোমাইড, ইথাইলিন-ডাই-ব্রোমাইড ব্যবহার করা হয়।

রোগনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি

রোগের জীবাণু কোথায় থাকে, গাছের কোন্ অংশ আক্রান্ত হয়েছে, রোগ কীভাবে বিস্তারলাভ করে প্রভৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে রোগনাশক ব্যবহার করা হয়। যথা-

বীজ শোধন

অনেক রোগ আছে যাদের জীবাণু বীজ নিজেই বছরের পর বছর বহন করে থাকে। বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্য বীজশোধন একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

বীজ শোধনের উপকারিতা

- বীজের মাধ্যমে অনেক জীবাণু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে অতি সহজেই বিস্তারলাভ করতে পারে। এসব বীজের উপর ও ভিতরে জীবাণু বেঁচে থেকে রোগ সৃষ্টি করে। বীজ শোধনের জন্য ঐসব জীবাণুর জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে রোগের বিস্তার রোধ করা সহজতর হয়।
- বীজবাহিত জীবাণুর জন্য অনেকক্ষেত্রে বপনের আগে বীজ পচে যায় অথবা অঙ্কুরোদ্গম হলেও পরে মূল বা গোড়া পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে বপনকৃত বীজ থেকে চারা নাও হতে পারে অথবা হলেও মরে যায়। বীজ শোধনের ফলে এসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা যায়।

- অনেক সময় বীজে কোনো রোগজীবাণু না থাকলেও মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন গণের ছত্রাকের (যথা- *Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium* প্রভৃতি) আক্রমণে অঙ্কুরোদ্গমের আগে বা পরে বীজ অথবা চারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে শোধিত বীজ বপন করলে বীজের গায়ে লেগে থাকা ওষুধ বীজের চারপাশের মাটিকে বিষাক্ত করে সেখানকার জীবাণুকে মেরে ফেলে এবং বীজকে একটা স্বাস্থ্যকর জীবাণুমুক্ত অঞ্চলে রাখে। এর ফলে নতুন গজানো অঙ্কুর বেশ নিরাপত্তার সঙ্গে রোগজীবাণু শূন্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে মাটির উপর উঠতে থাকে। সুতরাং বীজ শোধনের দ্বারা মাটিস্থিত রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে বীজকে ও অঙ্কুরোদগমউত্তর চারাগাছকে পচন রোগ হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- বিশ্ববিখ্যাত বীজ রোগতত্ত্ববিদ Dr. Paul Neergard লিখেছেন যে সমগ্র বিশ্বে এক বছরে বীজ বাহিত রোগের দ্বারা যে ক্ষতি হয় তা দক্ষিণ আমেরিকার এক বছরের উৎপাদিত ফসলের প্রায় সমান এবং বীজ শোধনের দ্বারা এই ব্যাপক ক্ষতির মোকাবেলা করা যায়।

বীজ শোধনের পদ্ধতিসম হকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়- (১) ভৌত পদ্ধতি ও (২) রাসায়নিক

বীজশোধনের পদ্ধতি

বীজ শোধনের পদ্ধতিসমূহকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়- (১) ভৌত পদ্ধতি ও (২) রাসায়নিক পদ্ধতি। বীজকে শুকনো অবস্থায় ও ভিজিয়ে শোধন করা যায়।

(১) ভৌত (Physical) পদ্ধতি

শুকনো অবস্থায় তাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে বীজকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ইনকিউবেটরে নির্দিষ্ট সময় রেখে তার জীবাণুকে ধ্বংস করা হয়।

ক. শুকনো অবস্থায় তাপ প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে বীজকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ইনকিউবেটরে নির্দিষ্ট সময় রেখে তার জীবাণুকে ধ্বংস করা হয়। যথা- লেটুসের মোজাইক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত বীজকে ৫৫° সে. তাপমাত্রায় ৮০ থেকে ১২০ দিন এবং টমেটোর এঞগঠ দ্বারা আক্রান্ত বীজকে ৭০° সে. তাপমাত্রায় ১ মাস রেখে বীজস্থ ভাইরাস নষ্ট করা হয়।

বীজের অভ্যন্তরীণ জীবাণু ধ্বংস করতে গরম পানি ব্যবহার করা হয়।

খ. গরম পানি ব্যবহার- বীজের অভ্যন্তরীণ জীবাণু ধ্বংস করতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে বীজকে সাধারণ তাপমাত্রায় একটি পাত্রে কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর ঐ বীজকে গরম পানিতে ডুবাতে হয়। কতক্ষণ বীজকে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে তা জীবাণু ও বীজের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। পানির উষ্ণতা এমন হতে হবে যেন তা কেবল জীবাণুকেই মারতে পারে কিন্তু বীজের সজীবতাকে কোনোমতেই যেন নষ্ট না করে। টমোটোর এনথ্রাকনোজ, অল্টারনেরিয়া ব-াইট ও ব্যাকটেরিয়াল স্পট রোগ; বেগুনের ফোমোপসিস (phomopsis) ব্লাইট রোগ; পালং শাকের ডাউনি মিলডিউ রোগের জন্য ৫০°সে. উষ্ণযুক্ত পানিতে ২৫ মিনিট রেখে বীজকে শোধন করা হয়। গমের আলগা ঝুল (loose smut) রোগের জন্য ঠান্ডা পানিতে ১২ ঘন্টা বীজকে ভিজিয়ে ৫৪° সে. উত্তাপবিশিষ্ট গরম পানিতে ঠিক ১৩ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হয়।

অবাত শোধন পদ্ধতিতে ভিজানো বীজকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়।

গ. অবাত শোধন- এ পদ্ধতিতে ভিজানো বীজকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়। গম ও বার্লির আলগা ঝুল রোগ দমনে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বীজকে ৫-৬ ঘন্টা ভিজিয়ে একটি পাত্রে রেখে তার মুখ শক্তভাবে বন্ধ করে রাখলে অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজ পাত্রমধ্যস্থিত অক্সিজেন গ্রহণ করতে থাকে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়তে থাকে। পাত্রমধ্যস্থিত অক্সিজেন শেষ হওয়ার পরও বীজ আকারে বড় হওয়ায় অনেকক্ষণ সজীব থাকতে পারে কিন্তু বীজের মধ্যস্থিত ছত্রাক অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। ফলে বীজ সজীব থাকে ও ছত্রাক তার মধ্যেই মরে যায়। তবে এ পদ্ধতিতে বীজ শোধন করতে হলে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ছত্রাক মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে না যায়। তাই, এ পদ্ধতির জন্য কত বীজ কত বড় পাত্রে কত ঘন্টা রেখে শোধন করা যায় তা পরীক্ষামূলকভাবে আগে থেকে নির্ধারণ করে নেয়া উচিত।

গমের আলগা ঝুল রোগ দমনে সূর্যতাপ প্রয়োগ পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

ঘ. সূর্যতাপ প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে প্রথমে বীজকে ৪-৫ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়। তারপর ভাদ্র মাসের প্রখর রোদে পাকা ঘরের ছাদে, পাকা রাস্তা বা টিনের ওপর পাতলা করে ছড়িয়ে ২-৩ ঘন্টা ধরে বীজকে শুকাতে হয়। গমের আলগা ঝুল রোগ দমনে এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। আলুর লেই ব্লাইট রোগের ছত্রাক আলুকে আক্রমণ করলে তাকে রোদে পরপর কয়েক দিন কয়েক ঘন্টা করে রাখলে তাপে আলুর মধ্যস্থিত ছত্রাক অনেকাংশে মরে যায়।

ঙ. চলমান বাষ্প প্রয়োগ- বীজকে তারের জালে নিয়ে একটি পাত্রে রাখা হয় এবং পরে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে বীজের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা হয়। সুগার বীট ও সরিষা পরিবারের বিভিন্ন ফসলের পাতায় দাগ ধরা রোগ দমনে এ পদ্ধতিতে বীজ শোধন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

(২) রাসায়নিক (Chemical) পদ্ধতি

শুকনো ও ভিজানো উভয় পদ্ধতিতে রোগনাশক দিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

শুকনো পদ্ধতিতে শোধনের নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ একটি পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে ওষুধ মিশাতে হয়।

ক. শুকনো পদ্ধতি- শুকনো পদ্ধতিতে শোধনের নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ একটি পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে ওষুধ মিশাতে হয়। অল্প পরিমাণ বীজ হলে ছোট কৌটায় বা টিনের পাত্রে (চিত্র-৬ ক ঃ ১ দেখুন) এবং বেশি বীজ হলে বড় পাত্রে বা বীজ শোধন যন্ত্রে এ কাজ করা হয়। এর জন্য সাধারণত কাঠ বা লোহার পায়ার ওপর একটি ড্রাম স্থাপন করে রোটারি ড্রাম নামে এক প্রকার বীজ শোধন যন্ত্র তৈরি করা হয় (চিত্র ৬ ক ঃ ২-৩ দেখুন)। ড্রামটি ঘুরানোর জন্য এক দিকে একটি হাতল লাগানো থাকে। বীজের গায়ে ওষুধ লাগনোর সুবিধার্থে ড্রামের মাঝখানে চারদিকে ফ্রেম দ্বারা আঁটকানো ধাতব পদার্থের একটি জাল বসানো থাকে। ড্রামের ২/৩ অংশ বীজ ভর্তি করে তাতে প্রয়োজনমতো গুড়ো ওষুধ যোগ করা হয়। পরে হাতল দিয়ে ড্রামটি কয়েক মিনিট ঘুরালে বীজগুলো ওলটপালট হওয়ার সময় ওষুধের গুড়ো দ্বারা বীজের উপরিভাগ আচ্ছাদিত হয়ে যায়। রোগনাশকের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রথমে বীজকে মিথোসিল নামক এক প্রকার আঠার সাথে মিশানো হয়। তারপর গুঁড়ো ওষুধ যোগ করে নাড়াচাড়া করা হয়। বীজের গায়ে আঁঠা লেগে থাকার দরুনে ওষুধ বীজের চতুর্দিকে আঁটকে একটি আবরণ তৈরি করে এবং প্রতিটি বীজকে একেকটি বাড়ির মতো দেখায়। এ পদ্ধতিকে 'পিলেটাইজেশন' বলা হয়।

অনেক সময় উদ্বায়ী ও বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টিকারী ওষুধ একটি বায়ুবদ্ধ পাত্রে নিয়ে তাতে কিছু শুকনো বীজ ঢেলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখে শোধন করা হয়।

চিত্র ৬ ক ঃ শুকনো পদ্ধতিতে বীজ শোধন
১- কৌটা (অল্প বীজের জন্য), ২ ও ৩- রোটারি ড্রাম (বেশি বীজের জন্য)

খ. ভিজানো পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে বীজকে ওষুধের দ্রবণ দ্বারা ভিজিয়ে শোধন করা হয় (চিত্র ৬ খ দেখুন)। যথা-

সিঞ্চন (ঝঢ়ৎরহশষরহম) পদ্ধতি- প্রথমে অনুমোদিত ওষুধ পরিমাণমতো পানির সঙ্গে মিশিয়ে দ্রবণ অথবা সাসপেনসান তৈরি করা হয়। তারপর অল্প অল্প বীজ ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে অল্প অল্প করে ওষুধের

দ্রবণ বা সাসপেনসান হস্ত চালিত স্প্রেয়ারের সাহায্যে অথবা ঝাঝরির সাহায্যে ছিটাতে হয়। ওষুধ প্রয়োগের পর একটি ভিজা চট দ্বারা কয়েক ঘন্টা বীজকে ঢেকে রাখা হয় এবং পরে শুকিয়ে বীজকে বপন করা যায় বা সংরক্ষণ করা যায়।

ডুবানো (Steeping) পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে বীজকে ওষুধের দ্রবণ বা সাসপেনসানে ১/২ থেকে ২ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখা হয়। এর ফলে বীজ পানির সঙ্গে কিছু পরিমাণ ওষুধও শোষণ করে নেয়। পরে বীজগুলো উঠিয়ে শুকিয়ে বপন করা যায় অথবা সংরক্ষণ করা যায়।

পারি (Slurry) পদ্ধতি- সাধারণত অল্প ওষুধে বেশি বীজ শোধনের নিমিত্তে বিদ্যুৎচালিত পারি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে গুঁড়ো ওষুধে সামান্য পরিমাণ (১০-২৫ মিলি লিটার/কেজি বীজ) কোনো তরল পদার্থ যোগ করে সুপ (Soup) -এর ন্যায় পারি তৈরি করা হয়। তারপর ওষুধ ও বীজ

চিত্র ৬ খ ঃ ভিজানো পদ্ধতিতে বীজ শোধন

পারি যন্ে নিয়ে বীজকে শোধন করা হয়।

সারণি ১ ঃ বিভিন্ন ফসলের বীজ শোধনে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ ও তাদের পরিমাণ সারণি ১ এ দেয়া হয়েছে।

ফসলের নাম	ওষুধের নাম	পরিমাণ
শুকনো পদ্ধতিতে শোধন ধান, পাট, গম, চীনা বাদাম ইত্যাদি	হেমাসান, সেরেসান, প্যারাসান	ওষুধ এক গ্রাম ও বীজ ৩০০ গ্রাম। পাটের ক্ষেত্রে ওষুধ ১ গ্রাম ও বীজ ৩০ গ্রাম
	ভিটাভ্যাক্স	ওষুধ ২-৪ গ্রাম ও বীজ ১ কেজি
ভিজানো পদ্ধতিতে শোধন ধান, আলু, পাট, ঢেঁড়স, টমেটো ইত্যাদি	এমিসিন, ন্যাগালন, ট্যাফাসন	ওষুধ ১ গ্রাম ও পানি ১ লিটার এবং সমস্ বীজ ভিজে যায় এ পরিমাণ বীজ
আখ, আদা, হলুদ ইত্যাদি	এরাটান ৬	ঐ
গম	ব্যাভিস্টান, বেনলেট, ক্যালিক্সিন, ভিটাভ্যাক্স	ঐ
ডাল ও সিমজাতীয় বীজ	ব্রাসিকল ২০	ওষুধ ২-৪ গ্রাম ও পানি ১ লিটার

৩। বীজ শোধনে সাবধানতা

বীজ শোধনে ব্যবহৃত ওষুধ বিষাক্ত বিধায় এগুলো ব্যবহারের সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যথা-

- ব্যবহারের সময় ওষুধ যেন চোখে, মুখে, নাকে প্রবেশ না করতে পারে জন্য মুখোশ বা কোনো কাপড় মুখে বেধে নেয়া উচিত।
- দেহে, বিশেষ করে হাতে কোনো ক্ষত থাকলে এ ওষুধ বা শোধিত বীজ নাড়াচাড়া করা উচিত।
- শোধিত বীজ যেসব পাত্রে সংরক্ষণ করা হয় তাতে 'বিষ' এ কথা লিখে রাখা উচিত।

- ওষুধ ও শোধিত বীজ শিশু ও গৃহপালিত পশুপক্ষির নাগালের বাইরে রাখা উচিত।
- ওষুধের পরিমাণ, শোধনের সময় প্রভৃতি যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

মাটিকে ভৌত এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে শোধন করা যায়।

২. মাটি শোধন পদ্ধতি

মাটিতে অনেক রোগজীবাণু বেঁচে থাকে। নানাবিধ উপায়ে এসব জীবাণুকে আংশিকভাবে ধ্বংস করা যায়। মাটিকে ভৌত এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে শোধন করা যায়।

১। ভৌত (Physical) পদ্ধতি

উত্তাপ দ্বারা মাটির জীবাণু ধ্বংস করা যায়। উত্তাপ দ্বারা মাটি শোধনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা-

(১) গরম পানি ব্যবহার- প্রথমে জমির মাটি এক ফুট গভীর করে খুঁড়ে ১´ × ১´ × ১´ জমিতে ৫-৬ গ্যালন হারে গরম পানি প্রয়োগ করতে হবে।

(২) আগুন (ভরৎব) ব্যবহার- এ পদ্ধতিতে মাটি শোধনকল্পে শুকনো খড়কুটা, গাছের ঝরা পাতা বা ডালপালা জমিতে ভালো করে বিছিয়ে পোড়াতে হয়। আগুনের তাপে জমির ওপরের ও নিচের কয়েক সেন্টিমিটার মাটি উত্তপ্ত হয়ে সেখানকার জীবাণু মারা যায়।

(৩) অগ্নিশিখা ব্যবহার- যন্ত্রের সাহায্যে অগ্নিশিখা মাটিতে নিক্ষেপ করে মাটিকে শোধন করা যায়। সাধারণত এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু বীজতলা ও চারা তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত ছোট ছোট মাটির পাত্রে অগ্নিশিখা প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যায়। নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখার উত্তাপ ২০০০ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ তাপে মাটি খুব গরম হয়ে তাতে অবস্থিত জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(৪) গরম বাষ্প (steam) ব্যবহার- অল্পবিস্তর এলাকার মাটি গরম বাষ্প প্রয়োগ করে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে মাটির অল্প নিচে ছিদ্রযুক্ত ধাতু নির্গত পাইপ বসিয়ে এর মধ্য দিয়ে গরম বাষ্ঁ প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এ দেশে সাধারণত ব্যবহার করা হয় না।

২। রাসায়নিক (chemical) পদ্ধতি- নানাবিধ ওষুধ প্রয়োগ করে মাটি শোধন করা যায়। ওষুধ দ্বারা মাটি শোধন পদ্ধতি গাছের প্রকৃতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। গাছ লাগানোর আগে, লাগানোর সময় অথবা পরে গাছ বৃদ্ধির সময় মাটিতে ওষুধ প্রয়োগ করে জীবাণু ধ্বংস করা যায়। মাটির জীবাণু ধ্বংসের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর উপরে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির উপরের কয়েক সেন্টিমিটার মাটির সঙ্গে ওষুধ মিশানো হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনজেকশন সিরিঞ্জ দ্বারা মাটির মধ্যে ওষুধ প্রবেশ করিয়ে জীবাণু ধ্বংস করা হয়। মাটি শোধনের পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

(১) ফরমালিন (formalin) ব্যবহার- এ পদ্ধতিতে প্রথমে জমির মাটি বারে বারে কুপিয়ে ভালোভাবে গুঁড়ো করতে হবে। পরে মাটি শুকালে শতকরা ৪ ভাগ ক্ষমতাসম্পন্ন ফরমালিন দ্রবণ তাতে ঢেলে ভালোভাবে ভিজাতে হবে। সাধারণত ১´ × ১´ জমির জন্য পাঁচ গ্যালন হারে দ্রবণ প্রয়োগ করতে হয়। এ ওষুধ প্রয়োগের পরপরই জমির মাটি ২৪-৪৮ ঘন্টা পুরু চট বা ত্রিপল বা পলিথিন সিট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। কোনো কারণে উপরোক্ত দ্রব্য না পেলে কলাগাছের পাতা পুরু করেও ঢাকার ব্যবস্থা করা যায়। এ অবস্থায় ৪৮ ঘন্টা রাখার পর ঢাকনি সরিয়ে ১০-১৫ দিন মাটি আলগা অবস্থায় রাখতে হয়। এ সময়ের মধ্যে মাটি দুএকবার ওলটপালট করে দিলে ভালো হয়। পরে মাটিতে যখন ফরমালিনের গন্ধ থাকে না তখন জমিতে বীজ বপন করা হয়। মাটির বা অন্য কোন পাত্রে বীজ বপন করতে হলে ওসব পাত্রের মাটি ফরমালিন দ্বারা শোধন করে নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে প্রতি এক ঘনফুট মাটির জন্য ১৭০ গ্রাম ফরমালডিহাইড পাউডার প্রয়োগ করা উচিত। ফরমালিন দ্রবণ ব্যবহার করলে পাত্রস্থ মাটি

প্রতি এক ঘনফুট মাটির জন্য ১৭০ গ্রাম ফরমালডিহাইড পাউডার প্রয়োগ করা উচিত।

ভিজাতে যতটা পরিমাণ দ্রবণ লাগে ততটা ব্যবহার করতে হবে। ওষুধ প্রয়োগ করে পাত্র ৪৮ ঘন্টা ঢেকে রাখতে হবে এবং পরে ঢাকনি সরিয়ে মাটি কয়েকবার আলগা করে শুকোনোর পর বীজ বপন করতে হয়।

নানা প্রকার ফিউমিগ্যান্ট অর্থাৎ গ্যাস বা ধূয়া সৃষ্টিকারী উদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ দ্বারা মাটি শোধন করা যায়।

(২) উদ্বায়ী প্রকৃতির বা গ্যাস সৃষ্টিকারী ওষুধ (fumigant) ব্যবহার- নানা প্রকার ফিউমিগ্যান্ট অর্থাৎ গ্যাস বা ধূয়া সৃষ্টিকারী উদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ দ্বারা মাটি শোধন করা যায়। ক্লোরোপিকরিন, মিথাইল ব্রোমাইড, ভ্যাপাম, নেমাগন প্রভৃতি ফিউমিগ্যান্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব ওষুধ সম্পূর্ণ জমিতে, গাছ লাগানোর সারিতে অথবা গর্তে ব্যবহার করা যায়।

ক্লোরোপিকরিন একটি উৎকৃষ্ট মাটি শোধক। এর অপর নাম টিয়ার গ্যাস এবং ১৩ বর্গ মিটার স্থানের মাটি শোধনের জন্য ৪৫৪ গ্রাম ওষুধ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ৩৮ সেন্টেমিটার পর পর গর্ত খুড়ে মাটির মধ্যে ১৫ সেন্টিমিটার নিচে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ওষুধ প্রয়োগের পর পর গর্তগুলো মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। বড় জমির ক্ষেত্রে ইনজেকটরের সাহায্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ও গভীরতায় ধূয়া সৃষ্টিকারী ওষুধ প্রবিষ্ট করা হয়। ওষুধ প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর যখন মাটি থেকে কোনো গন্ধ পাওয়া না যায় তখন বীজ বপন করতে অথবা চারা লাগাতে হয়। নেমাগন ও জিনোফস কম উদ্বায়ী ওষুধ অর্থাৎ এসব ওষুধ ধীরে ধীরে গ্যাসে পরিণত হয়। এসব ওষুধ প্রয়োগের পর মাটি ঢাকার প্রয়োজন হয় না এবং ফসল থাকা অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায়।

(৩) অনুদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ- ক্যাপটান, থাইরাম, ব্রাসিকল প্রভৃতি ওষুধ থেকে কোনো গ্যাস সৃষ্টি হয় না। এসব ওষুধ পানিতে গুলে জমিতে ছিটিয়ে অথবা জমি তৈরি করার সময় মাটির সঙ্গে শুকনো গুড়ো মিশিয়ে দেয়া হয়। কেরল (kerol) নামক এক প্রকার ওষুধ আছে যা মৃত্তিকাশ্রয়ী ছত্রাকের সংক্রমণ বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এক ভাগ কেরল ও ৫০০ ভাগ পানি মিশিয়ে প্রতি ৯০০ ব. সে. (প্রতি বর্গফুট) জমির জন্য ২ গ্যালন হারে প্রয়োগ করা হয়।

৩. গাছে ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি

ছত্রাকের বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও দমনের জন্য গাছে বিভিন্ন প্রকারের ছত্রাকনাশক (fungicide) ছিটানো হয়।

ছত্রাকের বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও দমনের জন্য গাছে বিভিন্ন প্রকারের ছত্রাকনাশক (fungicide) ছিটানো হয়। কিছু কিছু ওষুধ গাছের উপরিভাগে অবস্থিত ছত্রাকের সংস্পর্শে সরাসরি এসে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং কিছু কিছু ওষুধ প্রয়োগে ছত্রাকের সংক্রমণ নিবারিত হয়। প্রথম শ্রেণির ওষুধকে প্রত্যক্ষ (direct) ছত্রাকনাশক এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ওষুধকে রক্ষাপ্রদ (protective) ছত্রাকনাশক বলা হয়। ছত্রাকনাশক তরল, গুড়ো এবং প্রলেপ আকারে প্রয়োগ করা হয়।

(১) তরল অবস্থায় সিঞ্চন

রোগনাশক তরল অবস্থায় গাছে ছিটানো পদ্ধতি সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। সাধারণত পানিতে ভিজে এমন গুঁড়ো ওষুধ ছিটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ছিটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, যথা- বোর্দো মিক্সচার, বারগান্ডি মিক্সচার, কুপ্রাভিট, ডায়থেন এম-৪৫, হিনোসান, থাইরাম, জাইরাম, ব্যাভিস্টিন, বেনলেট, কাসুমিন, ডিউটার, কিটাজিন প্রভৃতি ওষুধ ছত্রাক রোগ দমনে ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দমনে ফাইটোমাইসিন, এগ্রিমাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার হয়। এসব ওষুধ ছিটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের স্প্রেয়ার ব্যবহার করা হয়। যথা-

এটোমাইজার ছাট আকারের স্প্রেয়ার এবং সাধারণত গৃস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়।

এটোমাইজারঃ এটা ছোট আকারের স্প্রেয়ার এবং সাধারণত গৃস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ স্প্রেয়ারে ওষুধ রাখার জন্য একটি ছোট আধার থাকে। ঐ আধারের উপরের দিকে একটি পাম্পার লাগানো থাকে যা দিয়ে পাম্প করার সাথে সাথে পানিমিশ্রিত ওষুধ ফোয়ারার ন্যায় বের হয়ে আসে। এ স্প্রেয়ারটিতে অল্প পরিমাণ ওষুধ থাকে বলে স্প্রেয়ারটি হাতে রেখে ব্যবহার করা হয়। চিত্র ৭.১ এ এ্যাটোমাইজার দেখানো হয়েছে।

বায়ু সংকোচন যোগ্য স্প্রেয়ার (Compressed air sprayer)ঃ এ স্প্রেয়ারে ৩-৪ গ্যালন ওষুধ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ধাতু নির্মিত একটি আধার থাকে। এর উপরের দিকে একটি পাম্প লাগানো থাকে

এবং আধারে ওষুধ রেখে মুখ আটকানোর পর পাম্প করলে আধারের ভিতরে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় বহির্গমন নলের মুখে চাপ মুক্ত হওয়ার ক্লিপ চাপ দেয়ার সাথে সাথে তরল ওষুধ নলের মধ্য দিয়ে নজলের (nozzle) মাধ্যমে সজোরে ফোয়ারার মতো বের হয়ে আসে। বায়ুর চাপ কমে গেলে আবার পাম্প করে নিতে হয়। এ স্প্রেয়ার ঘাড়ে রেখে ওষুধ ছিটানো হয়। এ স্প্রেয়ারের কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, এর মধ্যে ওষুধ মিশানোর কোনো ব্যবস্থা নেই এবং সেজন্য ওষুধ ছিটানোর সময় আধার বারে বারে ঝাঁকিয়ে পানির সঙ্গে ওষুধকে মিশিয়ে নিতে হয়। দ্বিতীয়ত, চাপ কমে গেলে পাম্প করার জন্য শুকনো স্থানে বা আইলের উপর স্প্রেয়ার এনে পাম্প করতে হয়। চিত্র ৭.২ এ বায়ু সংকোচনযোগ্য স্প্রেয়ার দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৭ ঃ বিভিন্ন প্রকারের স্প্রেয়ার
১। এ্যাটোমাইজার, ২। বায়ুসংকোচনযোগ্য স্প্রেয়ার
৩। ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ও ৪। হস্ত চালিত ডাস্টার

ন্যাপস্যাক (Knapsac) স্প্রেয়ার)ঃ পিঠে বহন করে এ স্প্রেয়ার দ্বারা ওষুধ ছিটাতে হয়। পিঠে ঝুলানোর জন্য স্প্রেয়ারে এক জোড়া বেল্ট পিছনের দিকে লাগানো থাকে। এর পাশে একটি

হস্ত চালিত পাম্পের হ্যান্ডেল আছে। হাটার তালে তালে হাতল দিয়ে পাম্প করে ক্ষেতে ওষুধ ছিটাতে হয়। এ স্প্রেয়ারের ভিতর ওষুধ মিশানোর ব্যবস্থা আছে এবং পাম্প করার সময় ওষুধ ও পানি সব সময় মেশার সুযোগ পায়। এর ফলে স্প্রে করার সময় মেশিন বারে বারে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন হয় না। এ মেশিনের আর একটি সুবিধা হলো যে এর মধ্যে বায়ুর চাপ সমানভাবে থাকে বলে একটানাভাবে স্প্রে করা যায়। চিত্র ৭.৩ এ ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার দেখানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ শক্তিচালিত স্প্রেয়ার (Power sprayer)ঃ বিস্তৃত এলাকায় ওষুধ ছিটানোর জন্য এ স্প্রেয়ার ব্যবহার করা হয়। এতে ওষুধ রাখার জন্য একটি বড় আধার বা ট্যাঙ্ক থাকে এবং বৈদ্যুতিক মটরের সাহায্যে এর মধ্যে বায়ুর চাপ সৃষ্টি করে ওষুধ ছিটানো হয়। ট্যাঙ্কের মধ্যে বায়ুর চাপ খুব বেশি থাকে এবং সবসময় এ চাপের পরিমাণ একই রকম থাকে বলে দ্রুত স্প্রে-এর কাজ সম্পন্ন করা যায়।

(২) শুকনো অবস্থায় ওষুধ সিঞ্চন

কিছু কিছু ওষুধের (যথা- গন্ধকচূর্ন, চূন মিশ্রিত গন্ধক চূর্ন প্রভৃতি) শুকনো গুঁড়ো গাছে ছিটানো হয়। এসব ওষুধ ভোরে শিশিরসিক্ত অবস্থায় অথবা সন্ধার আগে ছিটাতে হয়। গুঁড়ো ওষুধ ছিটানোর জন্য ডাস্টার ব্যবহার করা হয়। তরল ওষুধ ছিটানোর স্প্রেয়ারের ন্যায় ডাস্টার ও নানা প্রকারের হয়। যথা-

হস্ত চালিত ডাস্টারঃ অল্প পরিমাণ গুঁড়ো ওষুধ ছড়ানোর জন্য এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রে হস্ত চালিত পাম্পের সাহায্যে ওষুধ ছড়ানো হয়।

ন্যাপস্যাক ডাস্টারঃ এ যন্ত্রটি ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ারের মতো এবং পিঠে রেখে ওষুধ ছড়ানো হয়।

রোটারি ডাস্টারঃ এ ডাস্টার বড় ও ছোট বাগানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ যন্ত্রের মধ্যে চাকার আকারে একটি পাখা আছে। যন্ত্রটি পিঠে আটকিয়ে হাতলের সাহায্যে পাখা ঘুরালে তার মধ্যে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়ে নির্গমন নল দ্বারা ওষুধ বের হয়ে আসে। চিত্র ৭.৪ এ রোটারি ডাস্টার দেখানো হয়েছে।

শক্তিচালিত ডাস্টারঃ বিস্তৃত এলাকায় ওষুধ ছড়ানোর জন্য এ যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। ওষুধ ছড়ানোর জন্য ডাস্টারের মধ্যকার পাখা বৈদ্যুতিক মটরের সাহায্যে ঘুরানো হয়।

(৩) প্রলেপ হিসেবে ওষুধের ব্যবহার

বোর্দো পেষ্ট বা মলম অথবা তৈরি অবস্থায় অনেক তামাঘটিত ওষুধ মলম হিসেবে গাছের কান্ড ও শাখার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়ে রোগ দমন করা হয়। ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে যাতে রোগ সংক্রমণ হতে না পারে সেজন্য মলমের প্রলেপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ওষুধ ছিটানোর নিয়মাবলী

যাতে ওষুধ অপচয় না হয় এবং কার্যকর পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায় সেজন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যথা-

(১) স্প্রেয়ারে ঢালার আগে ওষুধ ছেকে নিতে হবে।
(২) শুকনো ও শান্ত আবহাওয়া ওষুধ ছিটানোর উপযোগী।
(৩) পাতা শুকনো থাকা অবস্থায় তরল ওষুধ ছিটাতে হয়।
(৪) সকালে পাতায় শিশিরসিক্ত অবস্থায় গুঁড়ো ওষুধ ছিটাতে হয়।
(৫) সর্বদা বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করতে হবে।
(৬) ওষুধ এমনভাবে ছিটাতে হবে যেন প্রত্যেকটি পাতা হতে ফোঁটা ফোঁটা ওষুধ ঝরতে থাকে।
(৭) বর্ষাকালে ওষুধ যাতে ধুয়ে না যায় সেজন্য নানা প্রকার আঠাল পদার্থ (যেমন-ঞবিবহ ২০) ব্যবহার করা উচিত।
(৮) গাছের পাতা তেলতেলে হলে বিস্তারক ও ওয়েটিং এজেন্ট ওষুধে মিশিয়ে নিতে হবে।
(৯) গাছে ফুল হওয়ার সময় ওষুধ না ছিটানো ভালো।
(১০) সর্বদা মুখোশ পরে স্প্রে করা উচিত।
(১১) স্প্রে করার পর যন্ত্র ভালোভাবে ধুয়ে ও মুছে তেল মাখিয়ে রাখতে হবে।
(১২) বিষাক্ত ওষুধ কোনো কারণে শরীরে প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডিমের সাদা অংশ ও দুধ পান করাতে হবে। পরে লবণের গরম পানি খাওয়াতে হবে। এসব প্রাথমিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডেকে পরামর্শ নিতে হবে।

রোগনাশক প্রয়োগ পদ্ধতির সারসংক্ষেপ

রোগনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি

১. বীজ শোধন

১। বীজ শোধনের উপকারিতা
২। বীজ শোধনের পদ্ধতি
(১) ভৌত পদ্ধতি
ক. শুকনো অবস্থায় তাপ প্রয়োগ
খ. গরম পানি ব্যবহার
গ. অবাত শোধন
ঘ. সূর্যতাপ প্রয়োগ
ঙ. চলমান বাষ্প প্রয়োগ
(২) রাসায়নিক পদ্ধতি
ক. শুকনো পদ্ধতি
খ. ভিজানো পদ্ধতি
গ. সিঞ্চন পদ্ধতি
ঘ. ডুবানো পদ্ধতি
ঙ. পারি পদ্ধতি
৩। বীজ শোধনে সাবধানতা

২. মাটি শোধন পদ্ধতি
১। ভৌত পদ্ধতি
(১) গরম পানি ব্যবহার
(২) আগুন ব্যবহার
(৩) অগ্নিশিখা ব্যবহার
(৪) গরম বায়ু ব্যবহার

২। রাসায়নিক পদ্ধতি
(১) ফরমালিন ব্যবহার
(২) উদ্বায়ী বা গ্যাস সৃষ্টিকারী ওষুধ ব্যবহার
(৩) অনুদ্বায়ী প্রকৃতির ওষুধ ব্যবহার

৩. গাছে ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি
১। তরল অবস্থায় ওষুধ সিঞ্চন
২। শুকনো অবস্থায় ওষুধ সিঞ্চন
৩। প্রলেপ হিসেবে ওষুধ ব্যবহার
৪. রোগনাশক ছিটানোর নিয়মাবলী

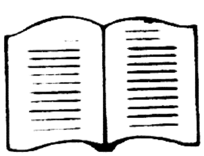

সারমর্ম ঃ রোগনাশক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য যা রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। রোগ দমনে রোগনাশককে প্রতিরক্ষাম লক, নিরাময়কারী ও অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বহু রকমের রোগনাশক বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। রোগের জীবাণু কোথায় থাকে, উহারা গাছের কোন্ অংশ আক্রমণ করে, রোগ কীভাবে বিস্তারলাভ করে প্রভৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে রোগনাশক ব্যবহার করা হয়। সাধারণত রোগনাশক বিভিন্নভাবে বীজে মাখিয়ে, গাছে ছিটিয়ে ও মাটিতে প্রয়োগ করে রোগ দমনের চেষ্টা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বীজতলার রোগ দমানার্থে কোন্ ওষুধটি ব্যবহার করা হয়?

ক) বারগান্ডি মিক্সচার
খ) বোর্দো মিক্সচার
গ) চেসান্ড কম্বাউন্ড
ঘ) কুপ্রাভিট

২। বোর্দো মিক্সচারের উপকরণ সামগ্রী কোন্‌টি?

ক) তুতে ৩৫০ গ্রাম, চুন ৩৫০ গ্রাম ও পানি ৪০ লিটার
খ) তুতে ৩৫৬ গ্রাম, চুন ৩৫০ গ্রাম ও পানি ৪০ লিটার
গ) তুতে ৩৬০ গ্রাম, চুন ৩৫০ গ্রাম ও পানি ৩৭ লিটার
ঘ) তুতে ৩৫৬ গ্রাম, চুন ৩৫৬ গ্রাম ও পানি ৩৭ লিটার

৩। চৌবাত্তিয়া মলমে কী কী থাকে?

ক) তিসির তেল, কপার কার্বনেট
খ) তিসির তেল, কপার কার্বনেট ও লাল সীসা
গ) তিসির তেল, কপার কার্বনেট ও গন্ধক
ঘ) তিসির তেল, গন্ধক ও তুতে

৪। কোন্ ওষুধটি বাংলাদেশসহ বহু দেশে ব্যবহার নিষিদ্ধ?

ক) টিনঘটিত জৈব রোগনাশক
খ) পারদঘটিত জৈব রোগনাশক
গ) পারদঘটিত অজৈব রোগনাশক
ঘ) গন্ধকঘটিত অজৈব রোগনাশক

৫। কোন্ স্প্রেয়ারটি পিঠে বহন করে ওষুধ ছিটানো হয়?

ক) বায়ু সংকোচনযোগ্য স্প্রেয়ার
খ) ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার
গ) এ্যাটোমাইজার
ঘ) শক্তিচালিত স্প্রেয়ার

৬। কোন্ ওষুধটি মাটি শোধনে ব্যবহৃত হয়?

ক) ক্লোরোপিকরিন
খ) ক্যারাথেন
গ) ডেক্সন
ঘ) ব্রাসিকল

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৫ উদ্ভিদ রোগজীবাণু শণাক্তকরণ

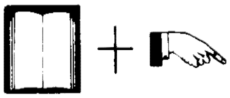

এ পাঠ শেষে আপনি –

- রোগজীবাণু শণাক্তকরণের উদ্দেশ্য বলতে ও লিখতে পারবেন।
- রোগের জন্য দায়ী জীবাণুকে রোগগ্রস্ত গাছ ও মাটি থেকে পৃথক করে শণাক্ত করতে পারবেন।

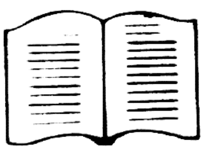

রোগজীবাণু শণাক্তকরণের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণে উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকারের রোগ হয়। কিন্তু অনেক সময় কেবল লক্ষণ দেখে রোগকে শণাক্ত করা যায় না। সেজন্য কোনো রোগের সাথে জড়িত কোনো প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ঐ জীবাণুকে রোগগ্রস্ত অংশ থেকে বিশুদ্ধভাবে পৃথক করে শণাক্ত করতে হয়।
- রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে জীবাণুর উর্দ্ধতন ক্ষমতা; জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রসার, রোগ উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণে জীবাণু নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করার প্রয়োজন হয়। এ কারণে জীবাণুকে পৃথক করে শণাক্ত করতে হয়।
- ব্যবহারিক ক্লাশ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুশীলন এবং গবেষণার জন্য জীবাণু শণাক্ত করা হয়।
- ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ জীবাণু সংরক্ষণ করার আগে তাকে শণাক্ত করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাণুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে অনুসন্ধান প্রণালী কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো এখানে সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে।

১. রোগ উৎপাদক ছত্রাক শণাক্তকরণ

১। সাধারণ পরীক্ষা

উপকরণ ঃ রোগগ্রস্ত অংশ, অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ, কাঁচি, পাইড, গ্লিসারিন (১০%), ফরসেপ, তুলি, কভার গ্লাস, ছত্রাক শণাক্তকরণের বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও পুস্তক, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- রোগগ্রস্ত অংশ মাইক্রোস্কোপের মঞ্চের ওপর রেখে সর্বাপেক্ষা কম শক্তিসম্পন্ন অবজেকটিভ লেন্স দ্বারা আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের অবস্থান লক্ষ্য করুন।
- কোনো স্থানে ছত্রাকের কনিডিওফোর ও স্ফোর দেখা গেলে সেখান থেকে কিছু অংশ নিয়ে শুকনো পাইডে এক ফোঁটা গ্লিসারিনের উপর রাখুন।
- বাম হাতে একটি ফরসেপ নিয়ে অক্রান্ত অংশ চেপে ধরুন এবং ডান হাতে একটি তুলি নিয়ে তার উপর দিয়ে কয়েকবার হালকাভাবে ঝাড়ু দেয়ার মতো টানুন। তুলির ঘর্ষনে ছত্রাকের স্ফোর ও অন্যান্য অংশের কিছু কিছু অংশ আক্রান্ত টিস্যু থেকে গ্লিসারিনের ফোঁটায় স্থানান্তরিত হয়।
- পাইডের গ্লিসারিন থেকে যাবতীয় ময়লা, আক্রান্ত অংশের বড় বড় টুকরো ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংশ তুলির সাহায্যে সরিয়ে একটি কভার গ্লাস স্থাপন করুন।

- পাইডটি মাইক্রোস্কোপের লেন্সের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণ করুন ও ছত্রাকের বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন। স্বাচ্ছ প্রকৃতির ছত্রাক স্কোর হলে গ্লিসারিনের স্থলে ল্যাকটোফিনল কটনব্লু ব্যবহার করুন।
- বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও পুস্তকের সাহায্য নিয়ে ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে তাকে শণাক্ত করতে চেষ্টা করুন।

২। চোষ কাগজ পদ্ধতি

অনেক সময় রোগাক্রান্ত অংশে ছত্রাকের স্কোর কনিডিওফোর ইত্যাদি দেখা যায় না। এ পরিস্থিতিতে চোষ কাগজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

উপকরণ ঃ প্রেট্রিডিস, চোষ কাগজ (blotting paper), কাঁচি, পাতিত পানি, রোগগ্রস্ত অংশ, মাইক্রোস্কোপ, পাইড, ল্যাকটোফিনল, তুলি, কভার গ্লাস, ছত্রাক শণাক্তকরণের পুস্তক ও ম্যানুয়েল, ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- রোগগ্রস্ত অংশ থেকে এক টুকরো অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে একটি কাচের পাইডে রাখুন।
- একটি পেট্রিডিসের নিচের ডালায় এক টুকরো চোষ কাগজ পেতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিন।
- পেট্রিডিসে অতিরিক্ত পানি থাকলে কাত করে তা ঢেলে ফেলুন ও রোগাক্রান্ত অংশসহ পাইডটি চোষ কাগজের উপর স্থাপন করুন।
- উপরের ঢালাটি নিচের ডালার উপর স্থাপন করুন এবং ২৪ – ৭২ ঘন্টা অনুশীলন কক্ষের টেবিলের উপর রেখে দিন। ভিজা চোষ কাগজ থেকে বাষ্পীভবনের ফলে পেট্রিডিসের ভিতরে প্রায় ১০০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা সৃষ্টি হয়ে বিশেষ আর্দ্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ আর্দ্র

  পরিবেশে রোগাক্রান্ত অংশের টুকরোতে ছত্রাক সুপ্ত অবস্থায় থাকলে তা সজীব হয়ে অনেক সময় স্কোর উৎপন্ন করে থাকে।
- স্কোর তুলি দিয়ে উঠিয়ে কাচের পাইডে ল্যাকটোফিনলের ফোটায় স্থাপন করুন ও মাইক্রোস্কোপের নিচে পর্যবেক্ষণ করুন।
- ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য একটি খাতায় লিখুন ও বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও পুস্তকের সাহায্যে শণাক্ত করুন।

৩। বিশুদ্ধ চাষ পদ্ধতি

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে আর্দ্র পরিবেশে স্কোর উৎপন্ন না হলে বিশুদ্ধ চাষের মাধ্যমে রোগ উৎপাদককে পৃথক করে শণাক্ত করা হয়।

উপকরণ ঃ রোগগ্রস্ত অংশ, পিডিএ আবাদমাধ্যম (২০০ গ্রাম খোসা ছাড়ানো গোল আলু, ২০ গ্রাম ডেক্সট্রোজ, ১৭.৫ গ্রাম এগার পাউডার ও ১ লিটার পানি), কনিক্যাল ফ্লাস্ক, তুলো, ব্রাউন পেপার, সুতা, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড বা ক্লোরক্স (১০%), এলকোহল (৫০%), ০.০১% মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশন, ফরসেপস, ওয়াচ গ্লাস, পেট্রিডিস, স্প্রিরিট ল্যাম্প, সসপেন, অটোক্লেভ, এক টুকরো পরিষ্কার কাপড়, ল্যাকটিক এসিড (৫০%), পিপেট, পাইড, কভার গ্লাস, গ্লিসারিন (১০%), তুলি, নির্বীজিত পানি, খাতা, ম্যানুয়াল ও বই।

কাজের ধাপ

ক. আবাদমাধ্যম (Culture medium) প্রস্তুত

- প্রথম পিডিএ আবাদমাধ্যম প্রস্তুত করুন। এর জন্য গোল আলু খোসা ছাড়িয়ে ২০০ গ্রাম মেপে নিন এবং টুকরো টুকরো করে কেটে একটি সসপেনে ৫০০ মি.লি. পানিতে সিদ্ধ করুন এবং পাতলা কাপড়ে ছেঁকে পরিষ্কার রসটুকু একটি পাত্রে নিন।
- আরও একটি পাত্রে ৫০০ মি.লি. পানিতে আলাদাভাবে এগার পাউডার মিশিয়ে গরম করে গলান এবং গোল আলুর রসের মধ্যে ঢালুন।
- পরে পাত্রে ২০ গ্রাম ডেক্সট্রোজ যোগ করে অতিরিক্ত পানি ঢেলে এক লিটার করুন এবং নেড়ে ভালো করে মিশান।
- এ আবাদমাধ্যম কাচের ফ্লাস্কে (অর্ধেকের একটু বেশি পরিমাণ) নিয়ে তুলো দিয়ে মুখ বন্ধ করুন।
- ফ্লাস্কের মুখ ব্রাউন পেপার দিয়ে মুড়ে সুতা দিয়ে বাঁধুন ও অটোক্লেভে ১৫ পাউন্ড বাড়তি চাপে ১৫-২০ মিনিট রেখে নির্বীজন (sterilize) করুন।
- এক টুকরো কাপড় ১% ফরমালিনে ভিজিয়ে একটি টেবিলের উপর বিছিয়ে দিন এবং তার ওপর নির্বীজন করা কয়েকটি পেট্রিডিস স্থাপন করুন।
- নির্বীজন করা আবাদমাধ্যম অল্প অল্প গরম থাকতে থাকতে (হাতে ফ্লাস্ক রেখে সহ্য করা যায় এমন গরম) তার মধ্যে নির্বীজন করা পিপেটের সাহায্যে ল্যাকটিক এসিড (১০০০ মি.লি. এর

  জন্য ১০ মি.লি.) যোগ করে আস্তে আস্তে দুলিয়ে ভালো করে মিশান এবং পেট্রিডিসের ওপরের ডালা একটু উঁচু করে ১৫ মি.লি. করে ডিসপ্রতি ঢালুন।
- আবাদমাধ্যমসহ পেট্রিডিসগুলো কিছুক্ষণ রেখে জমাট বাঁধান এবং একটির উপর আরেকটি সাজিয়ে রাখুন।

খ. রোগগ্রস্ত টিস্যু স্থাপন (চিত্র ৮ দেখুন)

- টেবিলের উপর তিনটি ওয়াচ গ্লাস স্পিরিট দিয়ে মুছে নির্বীজন করে পরপর সাজিয়ে রাখুন। প্রথমটিতে কয়েক মিলি লিটার ০.০১% মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশন ঢালুন এবং অন্য দুটি ওয়াচ গ্লাসে কিছু নির্বীজন করা পানি রাখুন।
- রোগগ্রস্ত অংশের কিনারা থেকে ছোট ছোট টুকরো কাটুন ও প্রথম ওয়াচ গ্লাসে মারকিউরিক

  ক্লোরাইড সলিউশনে ডুবান ১-২ মিনিট একটি নির্বীজ ফরসেপ দিয়ে নাড়াচাড়া করে রোগগ্রস্ত টুকরোর উপরিভাগকে জীবাণুমুক্ত করুন।
- মারকিউরিক ক্লোরাইড বিষাক্ত এবং সেজন্য রোগগ্রস্ত টুকরোর উপরিভাগ জীবাণুমুক্ত করার

  পর মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশন থেকে উঠিয়ে দ্বিতীয় ওয়াচ গ-াসের নির্বীজ পানিতে স্থাপন করুন। এখানে আবার কয়েকবার নাড়াচাড়া করে নির্বীজ ফরসেপ দ্বারা টুকরোগুলো তৃতীয় ওয়াচ গ্লাসের নির্বীজ পানিতে স্থানান্তর করে আগের ন্যায় নাড়াচাড়া করে টুকরোর উপরিস্থিতি মারকিউরিক ক্লোরাইড ধুয়ে ফেলুন।

  অনেক গাছের উপত্বকে ঘন লোম থাকে। ফলে, মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশন সহজে

  গাছের দেহের সংস্পর্শে আসতে পারে না। এজন্য আক্রান্ত অংশের টুকরোগুলোকে এ পদ্ধতিতে ভালো করে নির্বীজন করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিশনের সঙ্গে সমমাত্রায় ৫০% এলকোহল মিশিয়ে টুকরো নির্বীজন করা হয়। মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশনে টুকরো নির্বীজন করলে নির্বীজত পানিতে কমপক্ষে দুবার ধুয়ে আবাদ-মাধ্যমে স্থাপন করতে হয়। বারে বারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের সময় টুকরোতে বাতাসের

জীবাণু আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসব অসুবিধা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আজকাল ১০% ক্লোরক্স সলিউশনে একটি ওয়াচ গ্লাসে নিয়ে তাতে টুকরো ১ মিনিট ডুবিয়ে সরাসরি আবাদমাধ্যমে স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে ক্লোরক্সের ক্লোরিন গ্যাস হয়ে উড়ে যায় বিধায় টুকরোতে কোনো বিষাক্ত দ্রব্য থাকে না।

- সবশেষে টুকরোগুলে একটির পর একটি উঠিয়ে পেট্রিডিসে আবাদমাধ্যমের উপর স্থাপন করুন। আবাদমাধ্যমে স্থাপন করার আগে টুকরোর গায়ে লেগে থাকা অতিরিক্ত পানি দূর করুন। এর জন্য টুকরো পেট্রিডিসের নিচের ডালায় ভিতরের দিকে গায়ে স্পর্শ করুন অথবা সামান্য ঝাঁকি দিন এবং প্রতিটি পেট্রিডিসে তিন কোনায় একটি করে মোট তিনটি টুকরো স্থাপন করুন।
- টুকরোসহ পেট্রিডিসগুলো টেবিলের উপর অথবা ইনকিউবেটরে ৩-৪ দিন রাখুন। লক্ষ্য করুন এ সময়ে টুকরো থেকে আবাদমাধ্যমে ছত্রাক সুতার ন্যায় জন্মাতে থাকে এবং স্ফোর উৎপন্ন করতে থাকে।

চিত্র ৮ ঃ টিস্যু স্থাপন পদ্ধতিতে ছত্রাক চাষ

১- রোগগ্রস্ত পাতা, ২- রোগগ্রস্ত অংশ কর্তন পদ্ধতি, ৩- রোগগ্রস্ত অংশের কর্তিত অংশ,
৪- মারকিউরিক ক্লোরাইড সলিউশনে নিমজ্জিত কর্তিত অংশ,
৫ ও ৬- নির্বীজকৃত পানিতে কর্তিত অংশ ধৌতকরণ,
৭- কর্তিত অংশ আবাদমাধ্যমে স্থাপন

- নির্বীজিত নিডিলের সাহায্যে স্পোরসহ কিছু আবাদমাধ্যম তুলে একটি পাইডে এক ফোঁটা গ্লিসারিনে স্থাপন করুন।
- পাইডটির উপর একটি কভার গ্লাস স্থাপন করে মাইক্রোস্কোপের নিচে পর্যবেক্ষণ করুন।
- স্পোর ও অন্যান্য অংশ দেখা গেলে তাদের বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন ও প্রয়োজনমতো চিত্র আঁকুন।
- বিভিন্ন ম্যানুয়াল, চিত্র ও পুস্তকের বিবরণ মিলিয়ে ছত্রাক শণাক্ত করতে চেষ্টা করুন।

২. রোগ উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া শণাক্তকরণ

১। ব্যাকটেরিয়া চাষ

ব্যাকটেরিয়া শণাক্ত করার জন্য প্রথমে রোগগ্রস্ত অংশ থেকে ব্যাকটেরিয়া বিশুদ্ধভাবে চাষ করতে হবে। ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ করে বিশুদ্ধ করা হয়। নিচে কয়েকটি পদ্ধতি দেয়া হলো।

(১) টিস্যু স্থাপন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ

ছত্রাকের ন্যায় রোগগ্রস্ত গাছ থেকে ব্যাকটেরিয়াও একই পদ্ধতিতে আবাদমাধ্যমে চাষ করে শণাক্ত করা যায়। তবে এক্ষেত্রে পিডিএ আবাদমাধ্যমের পরিবর্তে নিউট্রিয়েন্ট এগার আবাদমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। এ আবাদমাধ্যম তৈরির পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো।

উপকরণ ঃ বিফ এক্সট্রাক্ট ৩ গ্রাম, পেপটোন ৫ গ্রাম, এগার এগার পাউডার ১৭.৫ গ্রাম ও পাতিত পানি ১ লিটার, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ১০% ক্ষমতাসম্পন্ন দ্রবণ।

কাজের ধাপ

- এগার এগার পাউডার ও অন্যান্য উপাদান আলাদা আলাদা পাত্রে দ্রবীভূত করে একত্রে মিশান এবং পানি যোগ করে সর্বমোট ১ লিটার করুন।
- আবাদমাধ্যম কনিক্যাল ফ্লাস্কে নিয়ে অটোক্লেভে নির্বীজন করুন এবং গরম থাকা অবস্থায় পরিমাণমতো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন পিপেটের সাহায্যে যোগ করে অম্লত্ব (p^H) ৭ এ নিয়ন্ত্রণ করুন।
- পেট্রিডিসে আবাদমাধ্যম ঢালা, মাধ্যমে রোগগ্রস্ত টুকরো স্থাপন ও অন্যান্য ধাপ ছত্রাক চাষের অনুরূপ।

(২) ডায়লুশান পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ

এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত অঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা পুঁজের ন্যায় ব্যাকটেরিয়ার অংশকে ব্যবহার করা হয়। চিত্র ৯ এ ডায়লুশন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ দেখানো হয়েছে।

উপকরণ ঃ পুঁজ যুক্ত আক্রান্ত অংশ, নির্বীজিত ৪টি পেট্রিডিস, ৪টি পিপেট, পানি, নিডিল, নিউট্রিয়েন্ট এগার কালচার টিউব (নিউট্রিয়েন্ট এগারসহ টিউব), স্পিরিট ল্যাম্প, এক টুকরো কাপড়।

কাজের ধাপ

- একটি টেষ্ট টিউবে কিছু নির্বীজিত পানি নিন।
- একটি নির্বীজিত নিডিলের সাহায্যে আক্রান্ত অংশ থেকে কিছুটা পুঁজ নিয়ে টিউবের পানিতে স্থানান্তর করুন এবং টিউব ঝাঁকিয়ে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন তৈরি করুন।

- একটি টেবিলের উপর এক টুকরো ভিজে কাপড় বিছিয়ে তার উপর ৪টি পেট্রিডিস পাশাপাশি সাজিয়ে রাখুন এবং প্রতি ডিসে পিপেটের সাহায্যে ৯ মিলি লিটার করে নির্বীজিত পানি মাঝখানে রাখুন।
- টিউব থেকে ১ মিলি লিটার ব্যাকটেরিয়াল সাসপেনশন পিপেটে উঠিয়ে পেট্রিডিসের ৯ মিলি লিটার পানির সাথে মিশান।
- প্রথম পেট্রিডিস থেকে ১ মিলি লিটার ব্যাকটেরিয়ামিশ্রিত পানি আর একটি পিপেটের সাহায্যে দ্বিতীয় পেট্রিডিসের ৯ মিলি লিটার পানির সাথে মিশান।
- এভাবে দ্বিতীয় পেট্রিডিস থেকে তৃতীয় পেট্রিডিসে এবং তৃতীয় পেট্রিডিস থেকে চতুর্থ পেট্রিডিসে এক মিলি লিটার ব্যাকটেরিয়ামিশ্রিত পানি স্থানান্তর করে ৯ মিলি লিটার পানির সঙ্গে মিশান এবং ১ঃ১০,০০০ পর্যন্ত ডায়লুশন তৈরি করুন।
- কিছু টেষ্ট টিউবে ১০ মিলি লিটার করে নিউট্রিয়েন্ট আবাদমাধ্যম নিয়ে নির্বীজন করার পর অল্প অল্প গরম থাকা অবস্থায় প্রত্যেক পেট্রিডিসে একটি টিউবের আবাদমাধ্যম ঢেলে ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিত পানির সঙ্গে মিশান।

চিত্র ৯ ঃ ডায়লুশন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া স্বতন্ত্রীকরণ
ক- টেষ্ট টিউবে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন প্রস্তুত
খ- ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন ডায়লুশন প্রস্তুত
গ- টেষ্ট টিউব থেকে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন আবাদমাধ্যমে স্থানান্তরণ

- পেট্রিডিসে আবাদমাধ্যম জমাট বাঁধার পর পেট্রিডিসগুলো ইনকিউবেটরে ২৮$^{\circ}$ - ৩০$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখুন।
- ডায়লুশনের ফলে ব্যাকটেরিয়া একে অপর হতে বিচ্ছন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বতন্ত্র ভাবে কলোনী উৎপন্ন করে। যে পেট্রিডিসে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা খুব কম থাকে সেখানে ব্যাকটেরিয়ার

  কলোনী কম ও দূরে দূরে হয়। এসব স্বতন্ত্র কলোনী থেকে টেষ্ট টিউবের আবাদমাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া স্থানান্তর করে বিশুদ্ধভাবে চাষ করুন।

(৩) আঁচড় পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ (চিত্র ১০ দেখুন)

উপকরণ ঃ জমাটবাঁধা নিউট্রিয়েন্ট এগার আবাদমাধ্যম, নিডিল, ইনকিউবেটর, নিউট্রিয়েন্ট এগার টিউব বা পান্ট ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- আক্রান্ত অংশের ছোট ছোট টুকরো একটি টেষ্ট টিউবে কিছু নির্বীজিত পানিতে রাখুন।
- টেষ্ট টিউবটি কয়েক মিনিট পর পর কয়েকবার ঝাঁকান (এর ফলে টুকরো থেকে ব্যাকটেরিয়া বের হয়ে পানির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন তৈরি হয়)।
- একটি নির্বীজিত নিডিলের অগ্রভাগ ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশনে ডুবিয়ে একটি পেট্রিডিসে জমাটবাঁধা নিউট্রিয়েন্ট আবাদমাধ্যমের উপর আঁকাবাঁকাভাবে হালকা আঁচড় কাটুন (আঁচড়ের ফলে আবাদমাধ্যমের উপর দাগ সৃষ্টি হয় এবং ব্যাকটেরিয়া নিডিল থেকে আবাদমাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। আঁচড়ের সময় নিডিলের অগ্রভাগ আবাদমাধ্যমের যেস্থান প্রথম স্পর্শ করে সেস্থানে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা খুব বেশি থাকে ও আঁচড় টানার সাথে সাথে সংখ্যাও কমতে থাকে এবং শেষের দিকে তার সংখ্যা খুবই কম হয়ে যায়)।
- পেট্রিডিস ২৪ ঘন্টা ইনকিউবেটরে রাখুন এবং লক্ষ্য করুন আঁচড়জনিত দাগের প্রথম দিকে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়ার সংঘ বা কলোনী মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং শেষের দিকে অল্প কয়েকটি কলোনী পৃথক পৃথক অবস্থায় থাকে।
- স্বতন্ত্র কোনো একটি কলোনীতে একটি নির্বীজিত নিডিলের অগ্রভাগ স্পর্শ করুন (এর ফলে নিডিলে ব্যাকটেরিয়া আঁঠার ন্যায় লেগে যাবে)।
- নিডিলটি একটি নির্বীজিত পান্টের আবাদমাধ্যমে স্পর্শ করে ব্যাকটেরিয়া স্থানান্তর করুন।
- পান্টটি টেবিলের উপর অথবা ইনকিউবেটরে রেখে ব্যাকটেরিয়াকে বিশুদ্ধ অবস্থায় জন্মাতে দিন।

চিত্র ১০ ঃ আঁচড় পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া চাষ
১- নিক্রোম তারের নিডিল ল্যাম্পের তাপে নির্বীজকরণ
২- নিডিল দ্বারা ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ ও ৩- নিডিলে সংগৃহীত
ব্যাকটেরিয়া আঁচড় দিয়ে আবাদমাধ্যমে স্থানান্তকরণ

২। চাষকৃত ব্যাকটেরিয়া শণাক্তকরণ

ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোট হওয়ায় ছত্রাকের ন্যায় উহাদের বিভিন্ন গণ ও প্রজাতি মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে সহজে শনাক্ত করা যায় না এবং সেজন্য অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়।

ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোট হওয়ায় ছত্রাকের ন্যায় তাদের বিভিন্ন গণ ও প্রজাতি মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে সহজে শণাক্ত করা যায় না এবং সেজন্য অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। তবে গ্রামস স্টেইন (Grams stain) নামক পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া পৃথক করা যায় (চিত্র ১১ দেখুন)।

উপকরণ ঃ বিশুদ্ধ ব্যাকটেরিয়া, কাঁচের পাইড, লুপযুক্ত নিক্রোম তারের নিডিল, স্পিরিট ল্যাম্প, পানি, গ্রামস ক্রিস্টাল ভায়লেট ও গ্রামস আয়োডিন, গ্রামস স্যাফ্রানিন নামক স্টেইন বা রঞ্জক, গ্রামস এলকোহল, মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতি।

কাজের ধাপ

- একটি শুকনো ও পরিষ্কার পাইড নিয়ে তার উপর মাঝখানে রঙিন পেন্সিল দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকুন।
- পাইডকে উল্টিয়ে বৃত্তের মধ্যে একটি নির্বীজকৃত নিক্রোম তারের লুপযুক্ত নিডিল দ্বারা এক ফোঁটা নির্বীজকৃত পানি রাখুন।
- নিক্রোম তারের লুপটি স্পিরিট ল্যাম্পে পুড়িয়ে নির্বীজ করুন এবং তার সাহায্যে ব্যাকটেরিয়ার বিশুদ্ধ কলোনী থেকে সামান্য একটু নিয়ে পাইডের উপরিস্থিত পানির ফোঁটায় ভাল করে মিশিয়ে ব্যাকটেরিয়ার একটি খুব পাতলা স্তর তৈরি করুন।
- ব্যাকটেরিয়ার স্তরটি বাতাসে শুকিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার উপর দিয়ে অতিক্রম করান। গরমে ব্যাকটেরিয়া মরে পাইডের গায়ে লেগে যায় (ব্যাকটেরিয়াকে মেরে এভাবে পাইডের গায়ে লাগানোর পদ্ধতিকে ফিক্সিং (fixing) বলা হয়)।
- পাইডে ফিক্স করা ব্যাকটেরিয়ার উপর গ্রামস ক্রিস্টাল ভায়োলেট রঞ্জক ঢেলে প্লাবিত করুন।
- এক মিনিট পর পাইডটি কলের নিচে রেখে পানি ঢেলে স্টেইন বা রঞ্জক যতটা সম্ভব ধুয়ে গ্রামস্ আয়োডিন দ্বারা প্লাবিত করুন।
- এক'দু মিনিট পর আবার কলের পানির সাহায্যে অতিরিক্ত স্টেইন ধুয়ে ফেলুন।
- তারপর পাইডের উপর ধীরে ধীরে গ্রামস্ এলকোহল ঢালতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না রঙ ওঠা বন্ধ হয়।
- সবশেষে পাইডটি পানিতে ধুয়ে গ্রামস্ স্যাফ্রানিন ঢালুন ও ২০ মিনিট পর আবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- পাইডটি শুকিয়ে মাইক্রোস্কোপের অয়েল ইমারশন লেন্সের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণ করুন। গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে পীতবর্ণ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে লাল বর্ণ দেখাবে।

চিত্র ১১ঃ ব্যাকটেরিয়া স্টেইনিং বা রঞ্জিতকরণ পদ্ধতি
১- নিক্রোম তারের লুপ দ্বারা ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ
২- পাইডের উপর পানির ফোঁটায় ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিতকরণ
৩- তাপে ব্যাকটেরিয়াকে ফিক্সকরণ
৪- স্টেইন বা রঞ্জক ঢেলে ব্যাকটেরিয়া রঞ্জিতকরণ

ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন গণ ও প্রজাতি সহজে শণাক্ত করতে না পারলেও উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রোগটি ছত্রাকজনিত না ব্যাকটেরিয়াজনিত তা শণাক্ত করা যায়।

> ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় কৃমিকে এগার আবাদমাধ্যমে জন্মানো যায় না। তবে যান্ত্রিক উপায়ে এদেরকে পৃথক করে শণাক্ত করা যায়।

৩. রোগ উৎপাদক কৃমি শণাক্তকরণ

ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় কৃমিকে এগার আবাদমাধ্যমে জন্মানো যায় না। তবে যান্ত্রিক উপায়ে এদেরকে পৃথক করে শণাক্ত করা যায়। বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতি কৃমি পৃথকীকরণের একটি উত্তম পদ্ধতি।

বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতি (চিত্র ১২ দেখুন)

উপকরণ ঃ গাছের আক্রান্ত শিকড় ও অন্যান্য অংশ, কাঁচের ফানেল বা চুঙ্গি, এক টুকরো রবারের নল, একটি পিন্‌চ ক্লাম্প, একটি স্ট্যান্ড, পানি, এক টুকরো মসলিন কাপড়, কাঁচি, স্টেরিওমাইক্রোস্কোপ, চুঙ্গিধারক ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

- কাঁচের চুঙ্গির নির্গমন নলে একটি রবারের নল লাগান এবং এর শেষের দিকে একটি পিন্‌চ ক্ল্যাম্প লাগান।
- একটি স্ট্যান্ডের উপরের দিকে ধাতব পদার্থের তৈরি একটি চুঙ্গি ধারক আটকিয়ে এর মধ্যে চুঙ্গিটি খাড়াভাবে স্থাপন করুন।
- চুঙ্গির ভিতরের দিকে উপরের কিছু অংশ বাকি রেখে এক খন্ড মসলিন কাপড় স্থাপন করুন।
- চুঙ্গিতে পানি ঢেলে কাপড় সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করুন।
- আক্রান্ত শিকড় খন্ড খন্ড করে কেটে চুঙ্গিতে কাপড়ের ওপরে রাখুন।

- চুঙ্গিটিকে ৪৮ – ৭২ ঘন্টা কোনো রকম নাড়াচাড়া না করে স্থিরভাবে এক স্থানে রেখে দিন। এ সময়ে কৃমি শিকড় থেকে বের হয়ে কাপড়ের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চুঙ্গির নির্গমন নলের নিচের দিকে জমা হতে থাকে।
- নির্গমন নলের নিচে একটি পেট্রিডিস স্থাপন করুন এবং পিন্‌চ ক্লাম্প আলগা করে কিছু পানির সঙ্গে কৃমি সংগ্রহ করুন।

চিত্র ১২ ঃ বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতিতে কৃমি পৃথকীকরণ
১- ফানেল, ২- মসলিন কাপড় ও তার উপর স্থাপিত শিকড়ের খন্ডসমূহ
৩- ফানেল হোল্ডার, ৪- পিনচ্‌ ক্ল্যাম্প, ৫- রবারের নল, ৬- পেট্রিডিস ও ৭- স্ট্যান্ড

- কৃমিসহ পেট্রিডিস স্টেরিওমাইক্রোস্কোপের নিচে স্থাপন করে কৃমির বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন। সম্ভব হলে কৃমির দেহ ও অন্যান্য অংশ কাগজে আঁকুন।
- কাঁচের পাইডে নেমাটোড রেখে মাইক্রোস্কোপে দেখলে তার বিভিন্ন অংশ ভালো দেখা যায় ও শণাক্ত করতে সুবিধা হয়। এজন্য একটি পরিষ্কার পাইডের উপর এক ফোটা পানি নিন। এখন স্টেরিওমাইক্রোস্কোপের নিচে রক্ষিত পেট্রিডিস থেকে তুলির সাহায্যে কয়েকটি নেমাটোড তুলে পাইডের উপর স্থাপন করুন। তারপর পাইডের পানির ফোঁটার তিন কোনায় তিন টুকরো খুব

  সূক্ষ্ম কাঁচের টুকরো স্থাপন করে তার উপর একটি কভার গ্লাস স্থাপন করুন (কাঁচের টুকরো স্থাপন না করলে কভার গ্লাসের চাপে নেমাটোড নষ্ট হয়ে যায়)। সবশেষে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর পাইডটি সামান্য গরম করে (হাতে সহ্য করা যায় এমন গরম) কৃমিকে মেরে মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করুন।
- কৃমি শণাক্তকরণের বিভিন্ন বই, চার্টের বিবরণ ও ছবির সঙ্গে আপনার কৃমির বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে শণাক্ত করতে চেষ্টা করুন।

মাটিতে কৃমি অবস্থান করে। সেজন্য আক্রান্ত জমির মাটি থেকেও কৃমিকে বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়।

মাটিতে কৃমি অবস্থান করে। সেজন্য আক্রান্ত জমির মাটি থেকেও কৃমিকে বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত শিকড়ের খন্ডের পরিবর্তে আক্রান্ত জমির মাটি পাতলা করে চুঙ্গির কাপড়ের উপরে ছড়িয়ে দিন। ৪৮ – ৭২ ঘন্টার পর চুঙ্গির নির্গমন নলের মধ্যে নিচের দিকে কিছু মাটির কণা জমে। এজন্য প্রথমে পিন্‌চ ক্লাম্প আলগা করে ময়লাযুক্ত কয়েক মিলি লিটার পানি ফেলে দিয়ে পেট্রিডিসে পানিসহ কৃমি সংগ্রহ করুন।

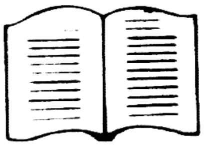

সারমর্ম ঃ রোগগ্রস্ত অংশ সরাসরি মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে, চোষ কাগজ ব্যবহার করে, আবাদমাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে চাষ করে ছত্রাক শণাক্ত করা হয়। ব্যাকটেরিয়া শণাক্ত করার জন্য টিস্যু স্থাপন, ডায়লুশন ও আঁচড় পদ্ধতি এবং কৃমি পৃথক করার জন্য বেয়ারম্যান ফানেল পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। উদ্ভিদ রোগজীবাণু শণাক্তকরণের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
- ক) গাছে রোগ সৃষ্টি করা
- খ) গাছের রোগ দমন করা
- গ) গাছের রোগ নিরূপণ করা
- ঘ) গাছের রোগজনিত ক্ষতি নিরূপণ করা

২। ছত্রাক চাষের জন্য কোন্ আবাদমাধ্যমটি সর্বোত্তম?
- ক) নিউট্রিয়েন্ট এগার
- খ) প্লেন এগার
- গ) পিডিএ
- ঘ) রোজ বেঙ্গল এগার

৩। কত পাউন্ড বাড়তি চাপে আবাদমাধ্যম নির্বীজন করা হয়?
- ক) ২০ পাউন্ড
- খ) ১৫ পাউন্ড
- গ) ২০ পাউন্ড
- ঘ) ২৫ পাউন্ড

৪। ব্যাকটেরিয়ার উপযুক্ত আবাদমাধ্যম কোন্টি?
- ক) পিডিএ
- খ) নিউট্রিয়েন্ট এগার
- গ) রিচার্ডস এগার
- ঘ) রোজ বেঙ্গল এগার

৫। সাধারণত ছত্রাকের স্পোর দেখার জন্য কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?
- ক) টিস্যু স্থাপন পদ্ধতি
- খ) চোষ কাগজ পদ্ধতি
- গ) ডায়লুশন পদ্ধতি
- ঘ) এগার প্লেট পদ্ধতি

৬। কোন্ রোগ উৎপাদক কৃত্রিম আবাদমাধ্যমে সচরাচর চাষ করা যায় না?
- ক) ছত্রাক
- খ) ব্যাকটেরিয়া
- গ) ভাইরাস
- ঘ) মাইকোপ্লাজমা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

১। উদ্ভিদে কী কী কারণে রোগ হয়।

২। ভাইরাসের সংজ্ঞা লিখুন।

৩। কীভাবে উদ্ভিদ রোগ বিস্তারলাভ করে।

৪। উদ্ভিদ রোগ বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫। হাইপোপ্লাস্টিক ও হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণের মধ্যকার পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বুঝান।

৬। প্রতিরক্ষামূলক ও নিরাময়কারী রোগনাশক বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৭। বীজ শোধনের উদ্দেশ্য কী?

৮। রোগনাশক ছিটানোর নিয়মাবলী লিখুন।

৯। নেক্রোসিসজনিত ৫টি রোগের বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১
১। ঘ   ২। ঘ   ৩। ঘ   ৪। গ   ৫। ক   ৬। খ

পাঠ ১.২
১। ক   ২। খ   ৩। গ   ৪। গ   ৫। খ

পাঠ ১.৩
১। খ   ২। ঘ   ৩। খ   ৪। ঘ

পাঠ ১.৪
১। গ   ২। ঘ   ৩। খ   ৪। গ   ৫। খ   ৬। ক

পাঠ ১.৫
১। খ   ২। গ   ৩। খ   ৪। খ   ৫। খ   ৬। গ